

জ্যাক লন্ডন

শ্রেষ্ঠ গল্প

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১২৪

গ্রন্থমালা সম্পাদক

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম প্রকাশ

জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ □ মে ১৯৯৬



প্রকাশক

বিশিষ্টকর মৈত্রী

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

১৪ কাকী নজরুল ইসলাম এডিনিউ

ঢাকা ১০০০ ফোন ৮৬৮৫৬৭

কম্পিউটার কম্পোজ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কম্পিউটার বিভাগ

মূল্য

এস আর প্রিন্টিং প্রেস

৭ শ্যামপ্রসাদ রায়চৌধুরী লেন, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ

সরদার জয়নুল আবেদীন

মূল্য

পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984-18-0153-0

ভূমিকা

মার্কিন লেখক জ্যাক লন্ডন (১৮৭৬-১৯১৬) তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প আর হীন তুচ্ছ অবস্থা থেকে অবিরাম সপ্তাহের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছেবার উদ্দীপনাময় কাহিনীসমৃদ্ধ ছোটগল্প এবং উপন্যাসের জন্য সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে পরিচিত। সমসাময়িককালের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক জ্যাক লন্ডন আজও স্বদেশে এবং বহির্বিদেশে বহুপঠিত একমাত্র মার্কিন লেখক হিসেবে বিবেচিত।

তাঁর জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোতে, ১৮৭৬ সালের ১২ জানুয়ারি। তাঁর মা ফ্লোরা ওয়েলশ্যান, জর্নিক ব্যবসায়ীর কন্যা এবং পিতা অধ্যাপক ডব্লু এইচ চ্যানসি, একজন ভবঘুরে জ্যোতির্বিদ। তাঁর আট মাস বয়সে তাঁর মা অধ্যাপক চ্যানসিকে ত্যাগ করে এক মধ্যবয়সী বিপ্লবীক জন লন্ডনকে দুই কন্যাসহ বিয়ে করেন। তখন তাঁর নাম পরিবর্তিত হয়ে জ্যাক লন্ডন হয়।

প্রকৃত পিতার সঙ্গে কোনোকালে জ্যাকের কোনো পরিচয় না ঘটলেও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সাহিত্যিক অশ্বেষা, সমুদ্রপ্রেম এবং মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া সমাজের ব্যাধি দূর করা সম্ভব নয় জাতীয় একটি অনড় বিশ্বাস আর মনোবিকলনগ্রস্ত মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কতকগুলো অস্বাভাবিক অঙ্ক প্রবণতা।

তাঁর যৌবন বয়সে সারা আমেরিকা ভ্রূড়ে নেমে এসেছিল অর্থনৈতিক মন্দার কাল। আমেরিকায় তখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজের সন্ধানে ভবঘুরে জীবন গ্রহণ করছে, বাস করছে বাসের অযোগ্য বস্তিতে।

ফ্লোরা লন্ডনের মনে দ্রুত অর্থ বানানোর একটি গোপন লিপ্সা ছিল। অর্থ জমানোর অভিপ্রায়ে এবং কিছুটা বাধ্য হয়েই স্বামীর রপ্তা স্বাস্থ্যসঙ্গেও এই বিভীষিকার ক্রমাগত চাপে এরা বার বার অপেক্ষাকৃত কমভাড়া বাড়িতে উঠতে থাকেন।

মা তাঁকে খুব অল্প সময় দিতেন, বরং মায়ের স্নেহ তিনি পেতেন মাশিম জেনি নামের এক নিগ্রো মহিলার অকৃত্রিম সেবা আর সংবান এলিজার ভালেবাসায়। এরাই ছিল তাঁর সারা জীবনের প্রিয় বন্ধু। স্বভাবে লাজুক ও আবেগপ্রবণ হওয়াতে নিজের দুর্ভাগ্যপীড়িত জীবন নিয়ে খুবই যত্নপা পেতেন তিনি। একসময় তিনি বলেছিলেন আমি এমন একজন বালক ছিলাম যার কোনো বাল্যকাল ছিল না।

চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই পরিবারকে তার আর্থিক সহযোগিতা করতে হত। তাঁর নিজের কথায়, ‘আমার শৈশব কাটে ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষিক্ষেত্রে, আমার বাল্যকাল কাটে একটি প্রাচীনাচ্যুতময় পশ্চিমা শহরের রাস্তায় রাস্তায় সংবাদপত্র ফেরি করে, আমার কৈশোর কাটে স্যানফ্রান্সিসকো। বে ও প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ভেসে’ বস্তুত জীবনের শুরু থেকেই জীবিকার জন্য তাঁকে বহুবধি কঠিন কাজ করতে হয়েছে। স্যানফ্রান্সিসকো উপসাগরে বেআইনী শুল্কি আহরণ ও চোর চালানির কাজ করেছেন, কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেছেন, জুসের কারখানায় প্রতি ঘণ্টা পশ সেন্ট হিসেবে প্রতিদিন আঠারো ঘণ্টার শ্রম বিকিয়েছেন, সিল মাছ শিকারি জাহাজে সিল শিকার করেছেন। কাজ করেছেন লম্বিতে, স্বর্ণাশ্বেযীর দলে যোগ দিয়ে দুঃসহ কষ্ট সহ্য করেছেন, স্ট্রেক উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়িয়েছেন ভবঘুরের মতো, আর কারাবাসও করেছেন সমাজতান্ত্রিক একটি সভায় বক্তব্য রাখার দায়ে। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া তাঁর খুবই অল্প। এন্ট্রান্স পাস করে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন কিছুদিনের জন্যে। কিন্তু প্রথম পর্বের পাঠ শেষ হবার আগেই সাময়িক জাহাজে চাকরি নিয়ে চলে যান।

জ্যাক লন্ডন মূলত কার্ল মার্ক্স, হার্বার্ট স্পেন্সার এবং ফ্রিডরিখ নিটশের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নিজের অভিজ্ঞতার জগৎটিকে অনুরূপ ব্যাখ্যা দেবার ব্যাপারে আত্মনিবেশ করেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবন তুলনামূলকভাবে খুবই সংক্ষিপ্ত বলা যায়।

বিপদসঙ্কুল রোমাঙ্ককর দুঃসাহসী বিষয় নিয়ে লেখা সেই সময়ের একটি সাধারণ লক্ষণ ছিল এবং জ্যাক লন্ডন সে-ধরনের রোমাঙ্ককর গল্প লিখেই লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *দ্য সান অফ দ্য উলফ* (১৯০০) একটি ছোটগল্পের সংকলন। জীবনের পরবর্তী সত্তেরাটি বছরের প্রতি বছরই তার দুই অথবা তিনটি করে বই প্রকাশিত হয়।

অর্থাৎ সত্তেরা বছরের সহিত জীবনে উনিশটি উপন্যাস, আঠারটি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সংকলন, তিনটি নাটক ও আত্মজীবনী এবং সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এর মধ্যে শিল্প হিসেবে সফল, জনপ্রিয় এবং তার সেরা গ্রন্থটির নাম *দ্য কল অফ দ্য ওয়াইল্ড* (১৯০৩)। বন্ধনহীন উদ্দাম অকপট প্রবাহের মধ্যেই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ উল্লাস নিহিত জ্যাক লন্ডন তার এই বিবাস্যটি *দ্য কল অফ দ্য ওয়াইল্ড*র প্রধান চরিত্র বাক (একটি কুকুর)-এর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাক নামক একটি কুকুর এর নায়ক। সে বন্য কুকুর। মানুষের সংস্পর্শে এসে সে দেখে সভ্য মানুষের জীবন সত্ত্বামের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে হিংস্রতা আর হানাহানি। অতএব সে বন্য নেকড়ে দলের সঙ্গে অরণ্যে ফিরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্যাক লন্ডনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

এই জাতীয় আরেকটি সফল অনতিদীর্ঘ উপন্যাসের নাম *হোয়াইট ফায়ার* (১৯০৩); এখানে লন্ডন কাহিনীটিকে একটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন। একটি বন্য নেকড়েকে গৃহপালিত প্রাণীর স্বভাবে চিত্রিত করেন। এইসব কাহিনীর মধ্যে দিয়ে জ্যাক লন্ডন দেখাতে চান মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের বাসনা কীভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধনের মাধ্যমে লাক্ষিত হয়। তার উল্লেখযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার সারিতে আরো দুটি উপন্যাস রয়েছে। *দ্য সিউলফ* (১৯০৪), এবং *মার্টিন ইডেন* (১৯০৯)। *দ্য সি-উলফ* এর নায়ক, জাহাজের ক্যাপটেন লারসেন-কে জ্যাক লন্ডন একেছেন একজন মনুষ্য ব্যাঘ্র হিসেবে, মানুষটি নির্ভীক হিংস্র সুন্দর এবং গতানুগতিক ন্যায়নীতি ও বিবেকের অনুশাসনের প্রতি যার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা, ভক্তি কিংবা আনুগত্য নেই, জীবনের প্রতি আদিম দুর্বীর ভালোবাসায় যে সারাক্ষণ টগবগ করে ফুটেছে। *মার্টিন ইডেন* তার আত্মজীবনিক উপন্যাস যার পরতে পরতে জ্যাক লন্ডনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসের নায়ক একজন জাহাজের নাবিক, জ্ঞান ও শক্তির দুর্বীর আকাঙ্ক্ষা যাকে একজন লেখক হিসেবে প্রথমে সাফল্য এনে দেয়। কিন্তু পরে যার মোহভঙ্গ ঘটে চোখ ধাঁধানো সামাজিক সভ্যতার বিবিধ স্খলনে, এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যায় নিবৃতি ঝুঁজে পায়। এই উপন্যাস এবং কতিপয় প্রবন্ধে *দ্য পিপল অফ দ্য অবিজ* (১৯০৩) জ্যাক লন্ডন সরাসরি ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে আখ্যাত করেছেন।

জ্যাক লন্ডন দুবার বিয়ে করেন, কিন্তু কোনো স্ত্রীই তার পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে নি। লেখালোভ থেকে তার আয় যত বেড়েছে স্বপ্নের বোঝা ততো হয়ে উঠেছে বিপুল। নিজের পরিবার ছাড়াও চেনা-অচেনা আত্মীয়-স্বজন পরগাছার মতো তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে আর সবটুকুই তিনি বহন করেছেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ক্রান্তির শিকার হয়ে জ্যাক লন্ডন মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ইউরেমিয়ায় আক্রান্ত হন, মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি মরফিন ও এট্রোফিনের একটি প্রাণনাশক মিশ্র ডোজ সেবন করে মৃত্যুকে গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স মাত্র চল্লিশ, তারিখ ২২, সন নভেম্বর, ১৯২২।

এই গ্রন্থে জ্যাক লন্ডনের অতি পরিচিত এবং আলোচিত পাঁচটি গল্প বেছে নেয়া হয়েছে। দুর্বীর গতিতে, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততায়, জীবন ও প্রকৃতির প্রতি আদি ও অকৃত্রিম ভালোবাসায় এই গল্পগুলো বেশিচ্যামবিত। উদ্দীপিত করার এক সহজাত গুণ ছিল জ্যাক লন্ডনের-পাঠককে যা সহজেই শুষু সক্রমণ করে না তাড়িতও করে। সংকলিত গল্পগুলো স্বভাবে এমনই।

জীবন তৃষ্ণা

সব কিছু মুছে গিয়েও থাকে কিছু—
ওরা যে হেসেছে, খেলেছে, ফেলেছে দান।
জীবনের পাশা খেলায় এইটুকুই লাভ,
সোনার ধূটিটা না হয় গেলই হারিয়ে।

তীর ধরে ওরা দুজনে বোড়াতে বোড়াতে এগোচ্ছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল ওদের হাঁটতে।
আগের জন টাল সামলাতে না পেরে ছড়ানো পাথরের ওপর হঠাৎ আছড়ে পড়ল। দুজনই
অত্যন্ত ক্লান্ত এবং দুর্বল। দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট সহ্য করে করে ওদের মুখে ফুটে উঠেছে
সহিস্রুতার কঠিন এক অভিব্যক্তি। কম্বলের গাটের বিরাট এক একটি বোকা ওদের পিঠে
ফিতে দিয়ে বাঁধা। দুজনের হাতেই একটি করে বন্দুক। আনত ওদের ভঙ্গি, কাঁধ দুটো
সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, মাথাটা আরো বেশি। দৃষ্টি মাটির ওপর নিবদ্ধ।

আমাদের বোচকাটার মধ্যে মাত্র দুটো করে যদি কার্তৃজ থাকত তো খুব ভালো হত।
দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল। বিষন্ন, অনুভূতিহীন কণ্ঠস্বর। আগ্রহশূন্য উক্তি।

পাথরের ওপর প্রবহমান ফেনিল জলস্রোত। প্রথম ব্যক্তি সদ্য তখন ঝুড়িয়ে ঝুড়িয়ে
নেমেছে সেই জলস্রোতের মধ্যে তাই প্রশ্নের উত্তর দেবার কোন তাগিদ অনুভব করল না
সে। অন্যজ্ঞান ওর পিছু পিছু চলেছে। হিম শীতল জল। এত ঠাণ্ডা যে হাঁটতে তীর যন্ত্রণা
হতে থাকে, পা দুটো ক্রমশ অসাড় হয়ে আসে। জুতো মোজা পরেও এই অবস্থা। মাঝে
মাঝে ওদের হাঁটুর ওপর জল আছড়ে পড়ছে। ঠাণ্ডায় ভারসাম্য হারিয়ে দুজনেই পা রাখার
মতো একটু জায়গা বোঁজে।

মসৃণ এক টুকরো পাথরে পা পড়তেই পেছনের লোকটির পা পিছলে গেল। আরেকটু
হলেই পড়েছিল আর কি। কোনো রকমে সামলে নেয় নিজে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে
ওর কণ্ঠস্বর। মনে হয় ওর মাথা ঘুরছে, বিভ্রান্ত। টলমল করতে করতে একটা
অবলম্বন বোজার জন্যে বাতাসের গায়েই একখানা হাত বাড়িয়ে ধরে। সামলে উঠে
আবার এক পা এগোয় কিন্তু ফের মাথা ঘুরে আছড়ে পড়ার উপক্রম হয়। স্থির হয়ে
দাঁড়িয়ে ও একবার সঙ্গীর দিকে তাকায়। ওর সঙ্গী কিন্তু একবারও ঘাড় ফেরানোর
প্রয়োজন বোধ করে নি।

পুরো এক মিনিট লোকটি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ভাব দেখে মনে হয় যেন নিজের সংগে
তর্ক করছে ও। তারপর চোঁচিয়ে বলল—এই বিল, আমার গোড়ালিটা মচকে গেছে রে।

বিলের কোনো ঝঞ্ঝেপ নেই। পেছন ফিরে একবার তাকালেও না। শুধু ফেনিল
জলস্রোতের মধ্যে টলমল করে তখন সে এগিয়ে চলেছে একমনে। পেছনের লোকটি সঙ্গীর
দিকে চেয়ে থাকে, ভাবলেশহীন মুখ, চোখে আহত হরিণের দৃষ্টি।

বিল ঝুড়িয়ে ওপারে ওঠে। উত্তাল জলস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও লক্ষ্য করে বিলকে।
ঠাণ্ডায় ওর ঠোট দুটা ধরখরিয়ে কেঁপে ওঠে। ঠোট ঢাকা গোঁফের কাঁড়টিও নেচে ওঠে তালে
তালে। জিত বার করে ও ঠোট দুটোকে ভিজিয়ে নেয় অনামনস্ক ভাবে কয়েকবার।

চোঁচিয়ে ডাকে, বিল।

দুর্দশা কবলিত একটি সবল মানুষের আর্ত আবেদন। তবু বিলের মাথা পিছন ফিরল না।

বিল এগিয়ে চলেছে। বাধোবাধো উলমলে চলন ভঙ্গি। বিচিত্র ভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চড়াচুটি পেরোচ্ছে। নিম্নভূমির পাছাভটার মোলায়েম আকাশ সীমারেখার দিকে নজর রেখে এগিয়ে চলেছে। শিবর পেরিয়ে বিল যতক্ষণ না চোখের আড়াল হল ততক্ষণ ও চেয়ে থাকে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বিল চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে। এখন ওর সঙ্গী বলতে শুধু নিঃশব্দ জাগতিক পরিমণ্ডল।

দিশস্ত পারে ধীর প্রজ্জ্বলিত স্নান সূর্য ঘন কুম্ভারের আবরণে ঢাকা পড়ে আরো স্নান হয়ে যায়। সীমারেখাখানী নস্পর্শগতিতে বিচিত্র এক জড় জগৎ। লোকটি এক পায়ে ভর রেখে পকেট থেকে গড়ি বার করে। চারটে বেজেছে। বুঝতে পারে, সূর্য উত্তর পশ্চিম দিক-নির্দেশ করছে কারণ, সময়টা এখন খুব সন্তব জলাইয়ের শেষভাগ কি আগস্টের গোড়ার দিক। হিসাবে দু-এক সপ্তাহের ফেরতের এড়ানো বর্তমানে ওর পক্ষে অসম্ভব। লোকটি দক্ষিণে তাকায় ও জানে ওই জনশূন্য পাছাভঙলার ওপারে কোনো এক জায়গায় গ্রেট বিয়ার লেক। তাছাড়া ওই দিকেই যে কোথাও কানাডিয়ান ব্যারেন্স-এর সাফ দিয়ে আকর্ষক সার্কোলের ভয়াবহ বিস্তৃতি, এও জানে। যে নদীটিতে ও এখন দাঁড়িয়ে সেটি কানার হাইনস নদীকে পুষ্ট করছে এবং শেখোক্তটি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ক্যারোনেশান বাড়ি ও আকর্ষক সাগরে গিয়েছে উজাড় করেছে। ওখানে কখনো ও যায় নি বটে তবে হাডসনস বে কোম্পানির চার্টে অঞ্চলটা একবার দেখেছিল।

যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকেই আরেকবার চোখ বোলায় লোকটি। সর্বত্রই কোমল আকাশ-রেখা। দুশাট এমন কিছু উৎসাহদীপক নয়। প্রতিটি পর্বত নিম্নভূমি ছুঁয়ে আছে। গাছপালা কোপকাড় ধাকা তো দূরের কথা, ঘাসের ডগাটিরও চিহ্ন নেই কোথাও—থাকার মধ্যে আছে শুধু ভয়ানক এক নিরুত্থান। ওর দু-চোখে তারই দ্রুত প্রতিফলন।

বিল। বিল। ফিস্‌ফিস্‌ করে বার কয়েক উচ্চারণ করে নামটা।

দুধগোলা থোলাটে জলের মধ্যে বুজো হয়ে দাঁড়ায় লোকটি। চারিদিকের সীমাহীন বিশালতা ওকে যেন গ্রাস করে। বিশালতের অসহনীয় ভয়াবহতা ওকে নির্মভাবে পোষণ করে। পালাজরগ্রস্ত রাগীর মতো ও কাঁপতে শুরু করে। কাঁপতে কাঁপতে এক সময় রাইফেলটা হাত থেকে খসে পড়ে যায়। হঠাৎ সংবধি ফিরে পেয়ে নিজের ভয় ভাঙতে চেষ্টা করে লোকটি। জল হাতড়ে রাইফেলটাকে উদ্ধার করে। আহত গোড়ালিটার ক্ষত বাঁচিয়ে সতর্কভাবে ধীরে ধীরে তীরের দিকে এগোতে থাকে।

আঘাত ও ক্ষতের যন্ত্রণা, শরীরের সব স্নাত্তিকে উপেক্ষা করে একটানা বদ্ধ উদ্ভাদের মতো এগিয়ে চলেছে—লক্ষ্য তার পর্বতের শিখরদেশ। এরই ওপারে তার সঙ্গীটি কিছুক্ষণ আগে অন্তহিত হয়েছে। উলমলে পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক সময়ে ও পর্বতের শিখর দেখে এসে হাজির হয়। শিখরে তো পৌঁছানো গেল কিন্তু সামনেই যে অগভীর এক উপত্যকা। জীবনের কোনো চিহ্ন সেখানে চোখে পড়ে না। জলসিক্ত পিচ্ছিল এই উৎরাই পেরোনো কি সহজ কাজ। মরিয়া হয়ে ওঠে লোকটি।

সঙ্গীহীন হলেও ও কিন্তু পথভ্রষ্ট নয়। জানে, উপত্যকা পেরিয়ে যানিক দুই এগোলে ছোট একটা দীঘির কাছে পৌঁছাবে। গ্রাম্য ভাষায় দীঘিটির নাম টিচিনিচিলি অর্থাৎ কচি-কক্কির দেশ। দীঘির পাড় ঘিরে ছোট ছোট শুকনো পাইন আর ফারের সারি। এখানে একটা নদী এসে পড়েছে। এর জল সুস্বাদু, দুধগোলা থোলাটে নয়। বেশ মনে আছে,

নদীটির দু-তীরে নল খাগড়ার বন। ওকে এই নদীর তীর ধরেই এগোতে হবে। যেখান এই নদীটি বাক নিয়েছে সেখানে না পৌঁছে ও থামবে না। নদীর এই বাকের মুখ থেকে পশ্চিমে আর একটা নদী প্রবাহিত হয়েছে। এই জলধারাটি ডিঙে নদীতে গিয়ে পড়েছে। এই দুই জলধারার সংযোগস্থলে ওর পাখির দিগে চাপা একটা উপুড় করা নৌকার তলা থাকে ও একটা বোচকা পাবে। এই বোচকার মধ্যে আছে শূন্য রাইফেলটির জন্যে কিছু টোটা, বড়শি, হিপ আর একটা ছোট জাল। খাদ্য সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন সরঞ্জাম। খুব বেশি না হলেও যানিকটা ময়দা মিলবে। সেইসঙ্গে কিছু বিন আর এক টুকরো বেকন।

ওখানে বিল অপেক্ষা করবে। ডিঙে নদীতে নৌকা বেয়ে ওরা দুজনে গ্রেট বিয়ার লেকে পৌঁছবে। তারপর লেক পেরিয়ে দক্ষিণ মুখে রওনা দেবে। ম্যাকেঞ্জি নদীতে না পৌঁছনো পর্যন্ত ওদের গতি দক্ষিণ মুখেই আবাহত থাকবে। ওখানে পৌঁছে আবার দক্ষিণে। হাড় কাঁপানো শীত ওদের পিছু ধাওয়া করে করুক, নদীর ঘূর্ণিজলে বরফ দেখা দেয় দিক, তবু ওদের চলার গতি ধামবে না। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করে ওদের মনের জোরেই ওদের গন্তব্যস্থলে এগিয়ে দেবে। দক্ষিণে হাডসন বে কোম্পানীর উষ্ণ কোনো অঞ্চলে পৌঁছে ওরা আবার চাপা হয়ে উঠবে। এ অঞ্চল অব্যয় সম্পদে ঐশ্বর্যময়ী, পর্যাপ্ত খাদ্যসম্পদের পরিপূর্ণ। পেষ্ট পুরে খেয়েও শেষ করা যাবে না কিছুতে।

দুর্ঘম যাত্রণ, কষ্টকর পথ প্রতিজ্ঞা, তাই মনকে তাগদ যাগোতে নানারকম চিন্তার জাল বুনে চলেছিল লোকটি। শরীরের সঙ্গে মনও লড়াই চালাচ্ছিল সমান তালে। ও কল্পনা করতে চায়, বিল ওকে একেবারে পরিত্যাগ করে যায় নি, রসদের বোচকাটার কাছে বসে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। একথা ভেবে ওর উপায় নেই। কেননা এই পরিশ্রমের তাহলে আর কোনো অর্থই থাকে না। আর সেক্ষেত্রে মৃত্যুকেই স্বীকার করে নিতে হয়। তা ও পারবে না।

স্নান সূর্যের রক্তাক্ত গোলাটি উত্তর পশ্চিমে ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই লোকটি এক পা এক পা করে মনে মনে কোমল বিলার সঙ্গে পাড়ি দিয়ে ফেলেছে দক্ষিণের দিকে। হাডসন বে কোম্পানির পোস্টে আর বোচকাটার মধ্যে কী কী রসদ আছে তার তালিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে থাকে লোকটি। দুদিন খাওয়া হয় নি। আর নমনমতা খাওয়ার সাথ তো অপরূপ রয়েছে বহু দিন। মাকে মখেই ঝুঁকে পড়ে বিবর্ণ মাসকেগ বেরি কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরে চিমাচ্ছে লোকটি। ও জানে এই বেরিতে কোন পুষ্টি নেই। তাতে কী! অর্জিত জ্ঞানের চেয়ে ক্ষুধা অনেক সত্যি। তাই অভিজ্ঞতাকে তুচ্ছ করে জলভরা তেতো মাসকেগ বেরি চিবিয়ে চলেছে।

তখন প্রায় নটা হবে। ছোট একটা পাথর পেরিয়ে আঙুলটা ঝুঁকে গেল। ক্লাস্ত দুর্বল শরীর, টাল সামলাতে না পেরে লোকটি হুড়মুড়িয়ে পড়ে মাটিতে। পাশ ফিরে যানিকক্ষণ নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকে ও। তারপর বোচকার বাহন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কোনোক্রমে ঘষড়ে ঘষড়ে উঠে বসার চেষ্টা করে। এখানে তেমন অন্ধকার হয় নি। যাই যাই করেও গোড়ালির স্নান আলো ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। সেই আলোয় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো শ্যাওলার সন্ধানো একটি গুলিক হাতড়ায় লোকটি। শ্যাওলার ছোট একটা খর জড়ো হলে তাতে আগুন জ্বালে। জল ফোটার বলে একটা টিনের পাত্রে করে যানিকটা জল বসায় আগুন। আগুন থিকিথিকি জ্বলেছে আর প্রবুর ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

বোচকা বুলেই সর্বপ্রথম ডেনিবার কাঠি গুণতে শুরু করে লোকটি। সাতহাটখানা রঙের। নিশ্চিত হতে তিন ডেনিবার গয়নে কলকল শব্দে ভাগ ভাগ করে

কাঠিগুলোকে অয়েল-পেপারে মুড়ে ফ্যালে। এক ভাগ রাখে তামাকের খলিটায়। এক ভাগ ভাঙচোরা টুপিটার ভিতরকার ফোটিয়ায় তলায়, আর তৃতীয় ভাগ রাখে সার্টির নিচে বুকোর-মধ্যে। কাজটি শেষ হবার পর আবার ওর ভয় করে, সব কটা মোড়ক খুলে ফেলে ফের গোনো। সেই সাতষট্টিখানাই রয়েছে।

শাওনের ধারে ডিজে জুতো-মোজা রেখে শুকিয়ে নিয়েছে। মোকাসিনটার একেবারে শতছিন্ন অবস্থা। কম্বলের তৈরি মোজার জায়গায় ফুটো, পা দুটো একেবারে রগরগে। রক্ত পড়ছে। গোড়ালিটা দপদপ করছে বলে একবার পরীক্ষা করে—ফুলে উঠে প্রায় হাঁটুর আকার ধারণ করেছে। কম্বল দুটোর একটা থেকে লম্বা করে একটা ফালি ছিঁড়ে নিয়ে গোড়ালিটায় কষে বাঁধে। আরো কয়েক ফালি ছিঁড়ে পায়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়ায়, মোকাসিন আর মোজা দুইয়ের কাজ করবে। বাটি ভরে ফুটন্ত জল পান করে, ঘড়িতে দশ দিয়ে কম্বলের তলায় গুড়ি মেরে ঢুক পড়ে।

লোকটি মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল। মাঝ রাত বরাবর কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তারপরই অন্ধকার কেটে যায়। উত্তর পূর্ব কোণে সূর্য ওঠে। ধূসর মেঘের আড়ালে ঢাকা মলিন সূর্য, কাজেই দিন শুরু হয়েছে কেবল ওদিকের অংশেই।

চলার সময় লোকটির ঘুম ভাল। ও তখনও শান্তভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে। দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ধূসর বর্ণ আকাশের দিকে। বুঝতে পারে ক্ষিদে পেয়েছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে উপুড় হতেই একটা নিশ্বাস ফেলার মতো শব্দ কানে আসে। চমকে দ্যাখে পক্ষাশ ফুট দূরে একটা বলগা-হরিণ সতর্ক ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করছে। সঙ্গে সঙ্গে সৈকা ও বলসানো এক টুকরো বলগা-হরিণের মাংসের রূপ আর স্বাদের কথা মনে পড়ে। যন্ত্রচালিতের মতো শূন্য বন্দুকটার দিকে হাত বাড়ায় লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টেপে। হরিণটা ঘোঁষ করে উঠে লাফ মেরে পালায়। পাখরের টুকরো পেরিয়ে ছোটার সময় খট-খট করে আওয়াজ হয় খুরে।

লোকটা গাল পেড়ে ফাঁকা বন্দুকটা টুড়ে ফেলে দেয়। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে সরবে কাতরে ওঠে। কাজটা শূন্যস্বাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। দোহের প্রতিটি গ্রন্থির অবস্থা মরচে ধরা কন্ডার মতো। দৈহিক কজ্ঞাগুলো বাঘো বাঘো ভাবে কাজ করছে। দর্ঘণ প্রতিমা বেশ প্রকট। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেরই অসম্প্রদায়গুলো নাড়াচাড়া করা সম্ভব হচ্ছে। পায়ে ভর রেখে দাঁড়াবার পর মিনিটখানেক লেগে গেল দেহটাকে সোজা করতে।

ছোট একটা ঢিলির ওপর উঠে গুড়ি মেরে আশপাশ লক্ষ্য করল লোকটি। গাছ নেই, বোপাঞ্চড় অবধি নেই। থাকার মধ্যে কেবল ধূসর শ্যাওলার অরণ্য। মাঝেমধ্যে এক আর্ধটা ছোট নদী কিংবা সরোবর চোখে পড়ে। আকাশেরও ধূসর বর্ণ। সূর্য নেই। এমন কি তার আন্তিরের কোনো ইঙ্গিতও নেই। লোকটি আন্দাজ করতে পারে না কেনটা উত্তর দিক। তাছাড়া কোন পথ ধরে গত রাত্রে এই জায়গাটিতে এসেছে তাও ভুলে গেছে সে। তবে এটা ভালো করেই জানে যে পথ হারায় নি। শিগগিরই কচি-কঞ্চির দেশে পৌঁছতে পারবে। অনুভব করে জায়গাটা বাদিকে কোথাও, খুব দূরও নয়—সম্ভবত স্ফি পাছাডটার ওপারেই।

বোঁচকাটার আকার ভ্রমণের উপযোগী করে তোলার জন্যে ফিরে আসে। নিজেই নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে দেশলাইয়ের কাঠি গুণতে গিয়ে সে খুব একটা বেশি সময় নষ্ট করে নি। সময় নষ্ট হয়েছে হরিণের চামড়ার পেটেমোটা খলিটা সম্পর্কে মনোস্থির করতে গিয়ে। খলিটা খুব একটা বড় নয়। দুহাত এক করে তার তলায় অন্যায়সে একটুক ডেকে রাখতে পারে। কিন্তু ওজন প্রায় পনের পাউণ্ড। জ্বিনিসপত্র সমেত পুরো বোঁচকার

ওজনের সমান। ভাবনাটা এই কারণেই। অনেক ভেবে চামড়ার ব্যাগটাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে বোঁচকার জ্বিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ফের চামড়ার ব্যাগটার দিকে তাকায়। তারপর এক হেঁচকায় জ্বিনিসপত্রের মাটির ওপর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বোঁচকায় পোরে। দেখে মনে হয় চরিদিকের ব্যগন্যতাই বৃষ্টি চোরের মতো ওর কাছ থেকে ব্যাগটাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। বোঁচকাটাকে কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটি। ধীর পায়ে যাত্রা শুরু করল দিনটির মোকামিলা করতে।

লোকটি এখন বা দিক বরাবর চলতে শুরুতে করেছে। মাঝে মাঝে মাসকেগ বেরি খাবার জন্যে চলায় ছেস পড়ছে। গোড়ালিটা আড়ট, খোঁড়ান ভাবটা আরো প্রকট হয়েছে। তবু এ যন্ত্রণা পেটের যন্ত্রণার কাছে ছোট নগণ্য। ক্ষিধের জ্বালায় পেটটা মোচড় দিয়ে উঠছে বারবার। ক্রমাগত পেট কামড়ানির ফলে যে পথ দিয়ে ওকে কঞ্চির দেশে পৌঁছতে হবে, তার ওপর আর স্থিরভাবে মনসংযোগ করতে পারে না সে। মাসকেগ বেরি পেটের জ্বালায় উপশম ঘটতে তো পারেই না উল্টো তার কটিন দর্শনে জ্বিত আর মুখের তালু জ্বালা করে।

একটা উপত্যকায় এসে পৌঁছল লোকটি। দেখতে পেল, পাহাড়ি মুরগির দল মাসকেগ বেরি আর শৈল স্তবক ছেড়ে ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ছে। ক্যার, ক্যার, ক্যার শব্দ করে ওরা উড়ছে। পাখিগুলোকে লক্ষ্য করে একটা পাখর ছোঁড়ে কিন্তু আঘাত করতে পারে না। বোঁচকাটাকে পাখির ওপর নামিয়ে রেখে, বেড়াল মনে গুটি গুটি পায়ে এগোয় ঠিক তেমনি করে গুটি গুটি পায়ে সম্ভরণে পাখিগুলোর নিকটবর্তী হয়। চোখা পাখরের ঝোঁটায় ওরা পাট চিন্ন হয়, শেষ পর্যন্ত হাঁটু থেকে রক্ত ঝরে চলার পথটি চিহ্নিত হতে থাকে। কিন্তু এ-জ্বালা ক্ষুধার জ্বালায় চাপা পড়ে যায়। ডিজে শেওলার ওপর সর্পিলা ভড়িতে বৃকে হাটে, জামাখাপড় ছিন্নভিন্ন, সারা দেহ হিম—কিন্তু স্বাদ্য সংগ্রহের উদ্দামদায় কিছুই অনুভব করে না। একটার পর একটা পাহাড়ি মুরগি কেবলই ওর সামনে দিয়ে ডানা ঝাপটে আকাশে পাড়ি জমালো। শেষ অবধি ওদের ক্যার, ক্যার, ক্যার ডাকটা ভেঙেচি কাটার মতো লাগে। পাখিগুলোকে গাল পেড়ে সরবে থগেরই ডাকের অনুসরণ করে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে হঠাৎ একটা পাখির একবারে ওপরে এসে পড়ে লোকটি। পাখিটা বোধহয় ধুমিয়ে ছিল। পাখিটাকে ও দেখতেও পায় নি। পাখরের বোঁদলে নিজের আশ্রয় ছেড়ে ঠিক ওর নাকের সামনে দিয়ে পাখিটা চম্পট দিল। মুরগিটার মতোই চমকে গিয়ে লোকটি হাত বাড়িয়ে ওটাকে ধরতে চাইল, কিন্তু পাখিটার পরিবর্তে ওর লেজের তিনটে পালক কেবল বজ্র মূঠোর মধ্যে রয়ে গেল। পলাতক পাখিটার দিকে চেয়ে ওটার ওপর ঘৃণা জাগে মনে দারুণ একটা গর্হিত কাজ করেছে। তারপর ফিরে এসে ফের বোঁচকাটা কাঁধে তুলে নেয়।

দিনের অনেকখানি পার হয়েছে। নানা উপত্যকা পেরিয়ে একট বোপাঞ্চড় ভরা অঞ্চলে এসে পৌঁছায় লোকটি। এখানে শিকার মেলার সুযোগ আরো বেশি। বন্দুকের আওতার মধ্যে দিয়ে খুব লোভনীয়ভাবে বিশ ত্রিশটা বলগা হরিণের একটা দল পেরিয়ে গেছে। একটা বড় আকাঞ্চা লোকটিকে পেয়ে বসে—ওগুলোয় পিছু ধাওয়া করার ইচ্ছা। ছুটে গেলে ঠিক ওদের ধরে ফেলতে পারবে। একটা কালো শেয়াল এবার ওর দিকে এগিয়ে আসে, শেয়ালটার মুখে একটা পাহাড়ি মোরগ। লোকটি চট্টিয়ে ওঠে। ভয় পাওয়ানো চিকার। চিৎকার শুনে শেয়ালটা ভয় পেয়ে পালায় ঠিকই, কিন্তু মুরগিটাকে ফেলে যায় না কোনোমতেই।

পড়ন্ত পর্বতের দিকে চুন-গোলা দূরপ্রভা একটা নদী ধরে ইটতে শুরু করে লোকটি।

নদীটা নলখাগড়ার ঝোপগুলোর মাঝ দিয়ে বইছে। নলখাগড়াগুলোকে শক্ত হাতে গোড়ার কাছে চেপে ধরে উপড়ে নেয়—দেখতে অনেকটা সদ্য গজানো পেঁয়াজের মতো। বস্তুটি নরম, চট করে দাঁত বসে যায়, তাই প্রথমে মনে হয় খেতে সুস্বাদুই হবে। আসলে অশমকীবা কিন্তু শক্ত! উদ্ভিদটি জলসিক্ত কিছু রৌয়ার সমষ্টি। ঠিক বেরিরই মতো, কোনো পুষ্টি নেই। বোচকাটা হুড়ে ফেলে লোকটি চার হাতে পায়ে ঝাঁড়ের মতো নলখাগড়ার ঝোপে ঢুকে কচমচ করে চেবোতে শুরু করে দেয় সেগুলোকে।

অত্যন্ত শান্ত হয়ে পড়েছে। কেবলই শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করছে। তবু ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হয়। অবশ্য এর পেছনে ‘ককির দেশ’—এ পৌছানোর প্রবল ইচ্ছে যতটা কাজ করছে তার চেয়ে বেশি করছে ক্ষুধার তাড়না। ছোট পুকুরগুলোর ব্যাধের সন্ধান করছে, কীটের সন্ধান নোখ দিয়ে মাটি খোঁড়ে অথচ এত উত্তর ব্যাঙ ও কীটের যে কোনো অস্তিত্ব নেই তা ও ভালোভাবেই জানে।

মিথোব প্রতিক্রিয়া পুকুরের মধ্যে চেয়ে চেয়ে দেখা। অবশেষে গোদুলির প্রথম লগ্নে একটি পুকুরে সাক্ষাৎ মিলল ‘মিনো’ নামে ক্ষুদ্র আকারের একটি মাছের। কাঁধ অবধি পুরো হাতটা সোজা জলের মধ্যে চালিয়ে দিল, মাছটা কিন্তু ওকে ঠকিয়েছে। তবু উমাদের মতো জলের মধ্যে ও দুহাত ঢুকিয়ে বুঁজে চলে, জলের তলাকার দূরধরতা গোটা গুলিয়ে ওঠে। উত্তেজনার মতো লোকটা শেষে জলে পড়ে যায়। কামর অবধি ভিজে পড়ে। জলটা এত গুলিয়ে গেছে যে মাছটাকে দেখতে পাবার আর কোনো আশাই নেই। যতক্ষণ না কাদা খিতোচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে।

যানিকক্ষণ বাদে আবার খোঁজ শুরু হয়। আবার গুলিয়ে ওঠে কাদা। কিন্তু আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ফিতে খুলে তিনের পাড়টায় বার করে জল সেচাতে শুরু করে লোকটি। প্রথমে উমাদের মতো সেচাতে শুরু করার ফলে নিজেও ভিজছিল আর জলটাকে তার বদলে পুকুরের এত কাছে ছুঁইছিল যে তা আবার পুকুরের ফিরে আসছিল। আরো সতর্কভাবে কাজ করছে ও এখন। হালপিগুলো যদিও বুকুর ওপর ধক্ ধক্ করে আঘাত করছে, হাত কাঁপছে, তবুও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে চেষ্টা করে। অধবর্মী পর জলের কুটী প্রায় শুকিয়ে আসে, এক কাপের মতো জলও নেই। কিন্তু কোথায় মাছ। তার বদলে পুকুরের তলাকার পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি ফোকর দেখতে পায়। নিশ্চয় ওটা ফোকর গলে পাশের বড় পুকুরটায় সটকেছে। এ পুকুরটাকে সারাদিন সারারাত ধরে সেচলেও জলশূন্য করতে পারবে না। ফোকর রয়েছে জানলে প্রথমই ওটার মুখটা একটি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারত, মাছটা তাহলে হাতে এসে যেত।

কথাটা ভাবতে ভাবতে কঁকুড়ে গিয়ে ভিজে মাটির ওপরই লুটিয়ে পড়ে লোকটি। প্রথমে নিজের মনে ঈপিয়ে ঈপিয়ে কাঁদছিল। তারপর চারদিক থেকে ঘিরে ধরা অকরণ নির্জনতাকে শুনিয়ে সরবে কাঁসতে শুরু করল। বহুক্ষণ ধরে শুকনো চাপা কান্নায় ওর দেহটা কৈপে কৈপে ওঠে।

এবার আশুন জ্বালিয়েছে লোকটি। যানিকটা গরম জল খেয়ে ঠাণ্ডাও কাটিয়েছে। গত রাতের মতোই একটা চোখা পাথরের ওপর ওর আঙুলের আন্তান। ঘুমোবার আগে দেশলাইয়ের কাঠিগুলোর শুষ্কতা পরখ করে ঘড়িতে দম দিয়ে নেয়। কাম্পলটা ভিজে আর চটচটে। গোড়ালিটাও যন্ত্রণায় দপদপ করছে। কিন্তু ও কেবল একটা কথাই বোকে : আমি এখন ক্ষুধার্ত। ঘুমের মধ্যে ভোক্তসভার স্বপ্ন দ্যাখে, দ্যাখে সবরকম খাদ্যসবোর পরিপাটি পরিবেশন।

ঘুম ভেঙে লোকটি দেখল তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে। সূর্য বলে কিছু নেই। পৃথিবী ও আকাশের ধূসরতা আরো ঘনীভূত হয়েছে—আরো ভীতিপ্রদ। বাতাস হিম শীতল। তুষারকণাপূর্ণ দমকা হাওয়া। পাহাড়ের চূড়াগুলোকে শুভবায় ঢেকে দিয়েছে। আশুন ছেলে আরো যানিকটা জল গরম করার সময় বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। আধো বৃষ্টিপাতের মতো তুষারপাত হতে শুরু করে। তুষারকণাগুলো আকারে বেশ বড়। অরিরাম তুষারপাত চলতে থাকে। জমি ঢাকা পড়ে যায়। মাটির সলসল এসে তুষারকণাগুলো গলে যাচ্ছে তাই জ্ঞানানো শেলগুলো ভিজে গিয়ে আশুনটা নিতে পেরে।

আর বসে থাকার উপায় নেই। বোচকাটা কাঁধে এটে আবার এগিয়ে চলল লোকটি বুড়িয়ে বুড়িয়ে। কোথায় যে যাবে তা অবশ্য সে জানে না। ক্ষুদ্র ককির দেশ, কি বিল, কি ভিজে নদীর তীরে পুণ্ডু কান নৌকো—কোনোটা জেনেই ওর মাথাব্যথা নেই। এখন কেবল একটি ধাতুপদ ওর ওপর প্রভুত্ব করছে : হাওয়া। লোকটি ক্ষুধা-পাগল। কোন পথ ধরে এগোচ্ছে সেদিকেও খেয়াল নেই। কোনোমতে এই শেওলাময় নিম্নমুখি পার হতে পারলেই বুশি। ভিজে তুষার আর জেলে মাংসকে বেরি এড়িয়ে নলখাগড়া ওপড়াতে ওপড়াতে আদ্যোচ্চ পা ফেলে এগিয়ে লোকটি। বস্তুটি বাদনীয়, তৃপ্তি পায় না একেবারে। একটা আগাছার সন্ধান পেয়েছে এবার—বাল কাল খেতে। যখনই চোখে পড়ছে খাচ্ছে কিন্তু বেশি চোখে পড়ছে না। আগাছাগুলো লতা গাছের মতো তাই কয়েক ইঞ্চি তুষার জমলেই চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

রাতে আর আশুন জ্বালতে পারা যায় না, গরম জলও জোটে নি এককোঁটা। কোনো উপায় না দেখে ঘুমের আয়োজন করতে কাম্বলের তলায় ঢুকে পড়ে কোনো রকমে। তুষারপাতের বদলে হিম শীতল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে এখন। অনেকবার ঘুম ভেঙে টের পেয়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার দরুন মুখের ওপর বৃষ্টি এসে পড়ছে।

সকাল হল। ধূসর, সূর্যনিম্ন প্রভাত। বৃষ্টি বহুতে গেছে। কৃষ্ণা তীব্রতাও নেই। খাদ্যসংক্রান্ত সমস্ত অনুভূতি নির্মূলভাবে লোপ পেয়েছে। পেটের মধ্যে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা আর ভারী ভারী ভাব, তবে এমন একটা কিছু বিরক্তিকর নয়। এখন ও আগের চেয়ে অনেক বেশি মুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করছে, ফলত আগের মতোই ককির দেশ আর ভিজে নদীর তীরে পুণ্ডু কান নৌকো—কোনোটা জেনেই ওর মাথাব্যথা নেই।

একটা কাম্বলের অবশিষ্টাংশটুকু পায়ে বেঁধে নেয় লোকটি। আঘাত লাগা গোড়ালিটাতে জড়ানো ফেট্রিটা আরেকবার ঠিক করে। আরেকদিনের পথ পরিক্রমার জন্যে তৈরি হতে থাকে। বোচকাটার কাছে এসে বেশে যানিকক্ষণ ভাবে হরিণের চামড়ার পেটোমটা ধলিটাকে নিয়ে কী করবে। শেষ পর্যন্ত ওঠে ওঠেই লুয়ে।

বৃষ্টির দরুন তুষার গলে গেছে, শুধু পর্বতশিখরগুলো এখনো সাদা দেখাচ্ছে। সূর্য উঠেছে বলে এখন এই দিক-যন্ত্রের সাহায্যেই ও দিক নির্ণয়তে সক্ষম হচ্ছে। অবশ্য এ কথা তার অজানা নয় যে ইতিমধ্যেই সে পথ হারিয়েছে। হলেও গত কদিনের যাত্রাকাল বেশি যাত্রায় ঝাঁ দিকে সরে এসেছে। তাই বিচ্যুতিটা শুধরে নিতে ডান দিক থেকে চলতে শুরু করে লোকটি।

যিদের চোটে পেটের মোচড় আগের মতো অসহনীয় ঠেকছে না বটে কিন্তু বুঝতে পারে সে কতদূর দুর্বল হয়ে পড়ছে। ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই সময়টুকুতে মাংসকে বেরি এবং নলখাগড়াদের আক্রমণ করার ইচ্ছো প্রবল হয়ে ওঠে। জিভটাকে বেশ শুকনো আর আকারে বড় ঠেকে—জিহ্বের ওপর ঘেন রোয়া গজিয়েছে। খাদ্যটা কটু মন হয়ে।

হৃৎপিণ্ডটা ওকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে। কয়েক মিনিট হাঁটতে না হাঁটতে বুকের ভিতরটা জোরে জোরে আন্দোলিত হতে থাকে। হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। মাথাটা ঘুরতে শুরু করে, জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়।

দুপুর নাগাদ একটা বড় পুকুরে দুটো মিনোর সাক্ষাৎ মিলল। এত জল ছেঁচে ফেলা অসম্ভব। মাথাটা এখন ওর বেশ ঠাণ্ডাই আছে। তাই চটপট তিনের পাত্রটার সাহায্যেই মাছ দুটোকে ধরে ফেলল। মাছ দুটো আঙুরের চেয়ে বড় হবে না, কিন্তু তাকে কী? ওর তো আর এখন তেমন ক্ষিদে নেই। পেটের মধ্যকার ভোঁতা যন্ত্রণাটা আরো কম অনুভব করছে। খিদের সময় না খেতে পেয়ে পেটটা ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। তবু কাঁচা মাছটা চিষিয়ে চিষিয়ে খায়। খাওয়ার জন্যেই ধাওয়া। বিচার খোজলেনই খেতে হবে।

বিকলে আরো তিনটো মিনো ধরতে পেরেছে। দুটো খেয়ে একটা বেখে দিয়েছে প্রাভারশের জন্যে। ইতস্তত গজানো শেঙার চাপড়াগুলো সূর্যকিরণে শুকিয়ে গেছে। জল গরম করে খানিকটা ঠাণ্ডা দূর করার সুযোগ পায় ও। আজ দশ মাইলের বেশি হাঁটতে ও পারেন। প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে পরদিন সেটা পূঁচ মাইলে এসে ঢেকাল। খিদের জন্যে আর কিছুমাত্র অবস্থি বোধ করছে না। পেটটা ঘুমিয়ে পড়ছে। এখন ও একটা অচেনা অঞ্চল পাড়ি দিচ্ছে। প্রচুর সংখ্যক নেকড়ে আর বলগা-হরিণের দেহা মেলে এখানে। নির্জন প্রান্তর পেরিয়ে বন বন তাদের ডাক কানে আসছে। আর একটা রাত পেরোলে। হরিণের চামড়ার পেটমোটা থলিটা উল্টোতেই তার মুখ দিয়ে অপরিশুদ্ধ স্রোনা আর সোনার তাল হলুদ স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে। সোনালো মোটাখুঁটি দুটো সমান ভাগে ভাগ করে এক ভাগ কম্পলের টুকরোয় মুড়ে বিচিত্র ধরনের একটা পাথরের চাঁইয়ের তলায় ফেলে দেয় আর অন্য ভাগটিকে বোঁচকায় পুরে নেয়। তারপর শেষ কম্পলটি থেকে একটা রশ্মি ছিঁড়ে পায়ে জড়ায়। বন্দুকটা যে এখনো ভ্যাগ করনি তার কারণ ভিজ্ঞে নদীর ধারে বোঁচকটার মধ্যে টোটা আছে।

দিনটা কুয়াশাচ্ছন্ন। আজ আবার খিদেটা চাপিয়েছে। অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে। মাথাটা এমন ভাবে ঘুরছে যে সময় সময় চোখে অন্ধকার দেখে। অবস্থা যা তাকে মাথা ঘুরে আছাড় খাওয়াও এমন কিছু অসম্ভব নয়। হঠাৎ মাথা ঘুরে একটা মুরগির বাসার ওপর গিয়ে পড়ে লোকটি। দিন যানেক হবে ভিম ফুটে চারটে ছানা বেরিয়েছিল বোধহয়। এক এক কণা স্পন্দিত জীবন। এক গ্রাসে সব কটাকে খেয়ে ফেলা যায়। খোলা গুহু ভিম চিবানোর মতো জ্যাঁত বাঙালকে মুখে পুরে চিবাতে শুরু করে। মা-মুরগিটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে ডানা বাপটায়। বন্দুকটাকে দগদগ মতো বাগিয়ে ধরে মা-মুরগিটাকে মারতে চায় কিন্তু পারে না। ঠিক পাশ কাটিয়ে সরে পড়ছে বার বার। বন্দুক দিয়ে মারতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। হঠাৎ একটা নিকৃষ্ট পাথরের আঘাতে মুরগিটার একটা ডানা ভেঙে যায়। মুরগিটা ভাঙা ডানাটা টেনে টেনে ছুঁটতে শুরু করে আর লোকটি তার পিছু ধাওয়া করে।

মুরগির ছানাগুলো সাময়িকভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটিয়েছে। আহত গোড়ালিটার ওপর কোনো রকমে ঠেক রেখে ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে এগায় লোকটি। পাথর ছোঁতে আর কর্তব্য কর্তে চেষ্টায়। আবার কখনো বা নিশ্চন্দ্রে এগিয়ে যাবে। মাটিতে পড়ে গেলে ধীরে সুস্থে উঠে বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাকায়। মাথা ঘোরার উপক্রম হলে তা কাটিয়ে ওঁর ডানা চোখ রগড়ায়।

ডানা ভাঙা মুরগিটার পিছু ধাওয়া করতে করতে লোকটি উপত্যকার নিম্নবর্তী জলাভূমিতে এসে পৌঁছায়। ভিজ্ঞে শেঙাগুলোর ওপর চোখ পড়তেই দ্যাখে কার যেন

পায়ের ছাপ। এ পায়ের ছাপ কোনোমতেই তার হতে পারে না। তাহলে বিলের নিচয়। কিন্তু এখন থামা চলে না। আগে ছুটন্ত মুরগিটাকে ধরতে হবে। তারপর ফিরে এসে অনুসন্ধান।

এক নাগাড়ে ছুটিয়ে ছুটিয়ে মুরগিটাকে নির্জীব করে দিয়েছে। কাত হয়ে শুয়ে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে মুরগিটা। লোকটিরও দম কুরিয়ে এসেছে। ঠিক মুরগিটার মতো কাত হয়ে শুয়ে লোকটি হাস করাতে লাগল। মুরগিটার সঙ্গে ওর ব্যবধান মাত্র কয়েক ফুটের। কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওটাকে ধরবে যে, নে-শক্তিও ও হারিয়েছে। লোকটি যতক্ষণ দম ফিরে পেয়ে মুরগিটার দিকে এগোল ততক্ষণ মুরগিটাও দম ফিরে পেয়েছে। লোকটির হাত পৌঁছানোর আগেই মুরগিটা সরে পড়ল। আবার শুরু হল পেছনে ছোটা। লোকটি খেঁচতে খেঁচতে রাত নেমে আসে। সুযোগ বুঝে মুরগিটা অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। অত্যন্ত দুর্বল শরীর। ছোট্ট খেঁচে টাল সামলাতে না পেরে লোকটি সোজা আছড়ে পড়ল মাটিতে। মুখে জোর আঘাত লাগে; চিবুকটা কেটে যায়। পিঠের ওপর বোঁচকটা যেমন বাঁধা ছিল তেমনই আছে। বেশ খানিকক্ষণ লোকটি নড়াচড়া করেন না। তারপর পাশ ফিরে শোয়। ঘড়িতে দম দিয়ে ওঁই ভাবেই শুয়ে কাটিয়ে দেয় সকাল পর্যন্ত।

দিনটা আজও কুয়াশাচ্ছন্ন। শেষ কম্পলের অর্ধেকটা চলে গেছে পায়ে ফেটি বাধার কাজে। অবশ্য তাকে কিছু যায় আসে না। বিদের প্রাচ ও তাড়নাতেই ও এখন এগিয়ে চলেছে। আচ্ছন্নভাবে পথ চলেতে চলতে পথে-বিলও কি পথ হারিয়েছে? দুপুর নাগাদ বোঁচকটার বোকা অসহ্য মনে হয়। যেটুকু সোনা ছিল ফের তা দুভাগে ভাগ করে। অর্ধেকটা এবার সোজাসুজি মাটিতে ছড়িয়ে দেয় তারপর একটু ভেবে বাকি অর্ধেকটাও ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সঙ্গে এখন কেবল আধখানা কম্পল, টিনের পাত্র আর বন্দুক।

একটা মায়াকম্পন। ওর অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবার। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে যে এখনো একটা টোটা আছে—কম্বুকেই পোরা আছে। আগেরবার দেখার সময় ঠিক চোখ এড়িয়ে গেছে। অথচ ও জানে, বন্ধুরের ভিতর আদৌ কিছু নেই। তবু এই মায়াকম্পনার হাত থেকে রেহাই মেলে না। এক অলীক কম্পনার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চলাবার পর বন্দুকটাকে ও মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বন্দুকটা খুলে দ্যাখে যথারীতি ওটার মধ্যে কিছু নেই। হতাশার তিক্ততা এত তীব্র যে মনে হয় যেন সত্যিই টোটাটা ও দেখে বলে আশা করেছিল।

আধখন্দটা ধরে খুব কষ্টকরভাবে চলার পর আবার মায়াকম্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে লোকটি। খুব চেষ্টা করে আজগুবি ভাবনার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার, কিন্তু রেহাই পায় না। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না দেখে এই আজগুবি ভাবনা আর সন্দেহের নিপন ঘটিতে বন্দুকটাকে আবার বুলে ফেলে। নানা চিন্তায় ভুবে গিয়ে যন্ত্রণাভিত্তির মতো পথ হেঁটে চলেছে। আত্মপ্রভারার এই উদ্ভ্রত চিন্তা কীর্তি মনে ওর মস্তিষ্ককে দংশাতে থাকে। কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা করে এই সুখ-স্বপ্নের স্বায়িত্ব খুব অল্পদক্ষণের, কারণ খিদের তীব্র ছালা অনবরত ওকে পিছনের ভাবনায় কিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুখ-চিন্তায় আচ্ছন্নতার মতো চলতে চলতেই হঠাৎ ওর সন্ধিৎসা ফিরে আসে। চোখের সামনে যা দেখেছে আর একটু হলেনি মুহুর্ত হয়ে পড়ত। দেহটা টিনের মতো করে ওঠে, মাভালের মতো এধার সেধার এলোমেলো পা ফেলে পতনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচায়। সামনেই একটা খোড়া দাঁড়িয়ে। খোড়া—একটা খোড়া। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। ঘন কুয়াশায় চোখ দূটো ঢেকে গেছে, তার মধ্যে বিন্দু বিন্দু আলোক কণা। পাগলের মতো চোখ ঘষে

পরিস্কার করতে চায়। দ্যাখো, কোথায় ঘোড়া।—খয়ের রঙা বিশাল এক ভালুক। উৎসুক যোদ্ধার মতো ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

বন্দুকটাকে প্রায় কাঁধ বরাবর তোলার পর, ছোরাটার কথা খেয়াল হল। বন্দুকটা তক্ষুনি নামিয়ে রেখে পুঁতি বসানো খাপ থেকে টেনে বার করল ছোরাটাকে। সামনেই রয়েছে বাঘা ও জীবন। বুড়ো আঙুলটা ছোরার কানার ওপর একবার বুলিয়ে নেয়। অত্যন্ত ধারালোভাবে এক নিমেষে ভালুকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। কিন্তু বুকের ভিতর থেকে সাধনাবাণী উচ্চারিত হয়—দম্প দম্প দম্প। বুকের ভিতরটা হাঁক পাঁক করছে, একটা লোহার সিঁড়ি দিয়ে কে যেন কপালটা টিপে ধরছে। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরার ভাবটাও বেড়ে চলে।

কিছুক্ষণ আগের বেপরোয়া ভাবটা কোথায় উবে গেছে। একটা অজানা আতঙ্ক ওকে পেয়ে বসে। ওর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জন্তুটা ওকে যদি আক্রমণ করে তখন উপায়? যতখানি সম্ভব শরীরটাকে টান টান করে নিভীকভাবে বাঁড়া হয়ে দাঁড়ায়। মুঠোর মধ্যে শস্ত করে চেপে ধরে ছোরাখানা। হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভালুকটার দিকে। ভালুকটা থপ থপ করে দুচার পা এগিয়ে আসে, ঠুঁটি মেরে বসে একটা গর্জন ছাড়ে। যেন দেখতে চায় লোকটা বুঝতে পারবে কিনা। লোকটি যদি ছোটে তাহলে ভালুকটাও ছুটবে। ভয় ভাবনা সব কিছুকে উপেক্ষা করে লোকটি মরিয়া হয়ে হয়ে গর্জন করে উঠল। বুনেো জন্তুর মতো, প্রাচুর্যমণ। যে ভীতি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, প্রাণের গভীরতর বোধই বারক উৎস, এ গর্জনে তাইর অনুরণন।

ভালুকটা গর গর করতে করতে একপাশে সরে যায়। রহস্যময় অবিচল এই মানুষটিকে স্থাপুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভালুকটাকে বিম্বিত। লোকটি একটুও নড়ে নি। যতক্ষণ না বিপদ অতিক্রান্ত হয় ততক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আতঙ্কপ্রপ্ত মানুষটি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভিজে শেঙলার ওপর লুটিয়ে পড়ে।

এতক্ষণে লোকটি বাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভয় কাটিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছে। এবার আর এক নতুন ভীতি ওকে পেয়ে বসে। খাদ্যের অভাবে ধীরে ধীরে বিতীক্ষিতা নয়। ভয়টা এই যে অনাহারে মৃত্যুর আগেই, বিচার এই লড়াইয়ে উদ্ভবের যে শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু ওকে এখনো অগ্রসর হবার ইচ্ছা জোগাচ্ছে, তা নির্বাণিত হবার আগেই, ওকে হত করে কোনো হিংস্র প্রাণীর শিকার হতে হবে। নেকড়েদের কথা কি তোলা যায়। নির্জন প্রান্তরের ধারার ওধার থেকে ওদের গর্জন ভেসে আসছে। নিশ্চলতার ঠাস বুনুনীকে ফলা ফলা করে গর্জন ছড়িয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড ঝড়ে ফুলে ওঠা তাঁবুর মতো ভাস্কর্য এই গর্জনের ঠেকাবে বলেই যেন নিজের অভ্যন্তরে লোকটি কখন দুহাত মূন্যে মেলে ধরে।

মাঝে মাঝে দুটো বা তিনটে করে এক একটা নেকড়েও দল ওর সামনে দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে পথ পার হচ্ছে। অবশ্য দল খুব ভারী নয় বলে কাছে ধাঁহতে সাহস পাচ্ছে না। তাছাড়া ওদের লক্ষ্য এখন বালগ হরিণদের দল। বালগ হরিণের কখন বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে তখন কী মরকার এই বিচিত্র দর্শন জীবনের কাছ থেকে। বলা তো যায় না, মাথা বাঁড়া করে যেভাবে হাঁটছে, তাতে আঁচড়ে কামড়ে দিলেও দিতে পারে।

বিকেল নাগাদ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু হাড়গোড় চোখে পড়ল লোকটির। আধখন্টখানেক আগে একটা বালগ হরিণের বাচ্চা নেকড়েদের শিকার হয়েছে। মাংসহীন চকচকে হাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে লোকটি ভাবে, একটু আগেও হরিণ-শিশুটি কক্কশ চিৎকারে

চারিদিক মাতিয়ে তুলছিল নিশ্চয়। প্রাণবন্ত চপল হরিণ শিশুটি এখন কতকগুলো মাংসহীন হাড়ের সমষ্টি মাত্র। তবু ওর মনে হয় ওই হাড়ের ভিতরকার জীবকোষে এখনো যেন প্রাণের স্পন্দন রয়েছে, বেশ লালচে দেখাচ্ছে। এমনও তো হতে পারে, দিন ফুরোবার আগে ওরও এই একই দশা হবে। এই তো জীবন, তাই না? অসার, সদা অপসূর্যমান। একমাংস জীবনই যন্ত্রণাদায়ক, মৃত্যুর মধ্যে কোনো যন্ত্রণা নেই। কখনোই ঘুমোনে। মানে বিরাম, অনন্ত বিশ্রাম। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে ও কে মৃত্যুবরণের চিন্তায় খুশি হতে পারছে না?

বেশিক্ষণ এসব নীতি কথা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল। ঘাসের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে মুখে একটা হাড় পোরে। প্রাণের ক্ষীণ অবশিষ্টাংশ থাকার দরুন হাড়ের ভিতরটা এখনো লাল দেখাচ্ছে। মিষ্টি মাংসের স্বাদ এতে এত কন্ম যে সত্যি মাংস বাচ্ছে না কল্পনায় তা উপলব্ধি করছে বোঝা দুষ্কর। তবে এটা ঠিক যে স্বাদটা ওকে পাগল করে দিয়েছে। হাড়ের ওপর দুপাটি দাঁত বসিয়ে কচমক করে চিবাতো শুরু করে। কখনো হাড়টা ভাঙে কখনো পরে দাঁত। শেষ পর্যন্ত হাড়গুলোকে একটা পাথরের ওপর রেখে আর একটা পাথর দিয়ে আঘাত করে। আঘাত করতে করতে সজ্জা সমেত হাড়গুলো একটা তালে পরিণত হলে স্টোকে গিলে নেয়। তাড়াহড়ায় আঙুলের ওপর বাড়ি পড়ে। অবাক হয়ে দ্যাখো, এত জোরে আঙুলের ওপর আঘাত পড়ার পরও তেমন ব্যথণ অনুভব করছে না।

ভয়হাৎ বৃষ্টি আর তুষারপাত শুরু হয়েছে। এ কদিন কখন কোথায় যে আস্তানা গেড়েছে আর কখনই বা তা গুটিয়ে নিয়েছে, নিজেই তা জানে না। দিনেও যত হেঁটেছে, রাত্তিরেও তত। চলতে চলতে যেখানে পড়ে গিয়েছে সেখানেই শুয়ে বিশ্রাম নিয়েছে। আর যে যে সময় মৃতপ্রাণী আরো নিবন্ত আলোকশিখরে মতো দম্প করে উঠে আরো স্নান হয়ে গিয়েছে তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়েছে। মানুষ হিসেবে ও আর এখন বুঝে না, বুঝে ওর মধ্যকার মরণে অনিচ্ছুক মৃতপ্রাণ প্রাণী। এই প্রাণটিই ওকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কষ্ট তেমন বেশ হচ্ছে না। স্নায়ুতন্ত্র ভেঁটা ও অসাড় আর মানসপটে শুধু অলৌকিক দৃশ্য ও লোভনীয় স্বপ্নের সমাবেশ।

বলগা হরিণের ছানটার সামান্য যে অবশিষ্টটুকু পড়েছিল, তাই জড়ো করে সে স্বে নিয়েছিল লোকটি। পর চলতে চলতে চূর্ণবিচূর্ণ হাড়গুলোকে ক্রমাগত চুষছে আর চিবিয়েছে। এর মধ্যে পথে আঁর কোনো পাহাড় বা জল-বিভাজিকা পেরোতে হয় নি। প্রশস্ত ও অগভীর উপত্যকার মধ্যে দিয়ে একটা বড় নদী বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ লোকটির খেয়াল হয় সে এখন ওই নদীটির তীর ধরেই এগিয়েছে। কখন যে সে ওই নদীর তীর ধরে এগিয়ে আসে শুরু করেছে, কখন যে উপত্যকাটা পেরিয়েছে, কিছুই তার স্মরণ নেই। এতক্ষণ সে শুধু কপিত্তে দৃশ্য ছাড়া কিছুই দেখতে পায় নি। দেহ ও প্রাণশক্তির বন্ধন সূত্রটি এতই ক্ষীণ যে যদিও এরা পাশাপাশি থেকে হাঁটছে বা হামাগুড়ি দিচ্ছে তবু এদের মধ্যে ব্যবধান মোটেই অস্পষ্ট নয়।

দুখ ভাঙার পর প্রথম খেয়াল হল সে একটা চোখা পাথরের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সূর্যের উজ্জ্বল উষ্ণ আলো চারিদিক ভরিয়ে দিয়েছে। দূর থেকে বলগা হরিণের বাচ্চাগুলোর কুঁই কুঁই শব্দ কানে আসছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর তুষারপাত কিংবা বোড়ো বাতাসের সশব্দীয় আরো আবছা কিছু কিছু কান মানসপটে ভেসে উঠবে। কিন্তু প্রবল ঝড়ের দাপটে কাবু হয়ে দুদিন শুয়ে কাটিয়েছে, না দু-সপ্তাহ—তা সে জানে না।

খানিকক্ষণ নিশ্চলভাবে শুয়ে থাকে লোকটি। অকৃপণ সূর্যরশ্মি ঝরে পড়ে ওর ওপর,

দুয়ার ও বাক্সবিহীন হিমশীতল শরীরটাকে উষ্ণতায় ঢাকা করে তোলে। মনে মনে ও চিন্তা করে নিন্টি আজ ভারী সুন্দর, ভারী উজ্জ্বল। এখন সে ঠিক কোথায় আছে, আজই হুত তার হিমিত করতে পারবে। নিচ দিকে একটা প্রশস্ত ধীরস্রোতা নদী বয়ে যাচ্ছে। অপরচিত নদীটিকে দেখে ও অবাক হয়। চোখ মেলে জলধারাটিকে অনুসরণ করে। বড় বড় বাঁক নিয়ে বহু নিচু আর নেড়া নেড়া পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ফিরে এগিয়ে গেছে নদীটি। এ পর্যন্ত যে-কটা পাহাড় ও দেখেছে ওগুলো আকারে তার চেয়ে ছোট এবং আরো নেড়া। লোকটি এবার নদীর পথেরাখা অনুসরণ করছে। উত্তেজনাহীন ধীর পদক্ষেপ—আগ্রহ যেটুকু প্রকাশ পায় তা অতি মামুলি ধরনের। উজ্জ্বল এক সাগরে গিয়ে পড়েছে নদীটি। এ দৃশ্যও কিন্তু লোকটিকে উত্তেজিত করতে পারে না। ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার, মনে মনে ভাবে। এটা কাল্পনিক দৃশ্য না মরীচিকা? খুব সম্ভবত কাল্পনিক দৃশ্য, বিশুদ্ধ মনের একটা চাতুরি। বলমলে সমুদ্রের মাঝখানে একটা জাহাজকে নোঙর ফেলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। মৃত্যুর জন্যে চোখ বন্ধ করে, তারপর আবার খোলে—আশ্চর্য, এখানে দৃশ্যটা মেলায় নি। তবে আশ্চর্য হবারের বা কি আছে, এতো খোলে জানে যে বন্ধা প্রান্তরের মাঝ মধ্যখানে সমুদ্র বা জাহাজ থাকতে পারে না। যেমন জানত—বন্দকে টোটা নেই—

পিছনে একটা ঘড় ঘড় শব্দ শোনে—কতকাটা হাঁপ ওঠার মতো। শারীরিক দুর্বলতার জন্যে খুব আস্তে আস্তে পাশ ফেরে। কাছাকাছির মধ্যে কিছুই নজরে পড়ে না। তবু স্বেচ্ছ ধরে প্রতীকী করে যদি কিছু দেখতে পারে। আবার ঘড় ঘড় শব্দ কানে আসে। বোধ হয় কুড়িফুট দূরও হবে না, এবড়ো খেবড়ো দুটো পাথরের মধ্যে একটা নেকড়ে ধূসর মুখখানা চোখে পড়ে। নেকড়েটার কানগুলো তেমন ছুঁচোলা নয়। তাছাড়া চোখ দুটো ঘমা-ঘমা রক্তবর্ণের। মাথাটা অসহায়ের মতো খুলে রয়েছে। জঙ্কট সূর্যালোকে ক্রমাগত চোখ পিটি পিটি করে তাকাচ্ছে। অসুস্থ বলেই নয় হয়। জঙ্কটটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই ফের ওটার হাঁপ ওঠে, কাশে। এখন ও যা দেখছে সেটা যে অলীক কিছু নয়, তা ও নিশ্চিতভাবে বুঝেছে। উল্টো দিকে চোখ ফিরিয়ে একবার বাতর জগতটাকে ভালো করে দেখে নেয়। এতক্ষণ এই বাতর জগতটাই কাল্পনিক দৃশ্যের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! দূরে সমুদ্রটা এখনো বাকমক করছে, জাহাজটাও পরিস্কার চোখে পড়ছে। তাহলে যা দেখছে সত্যি? চোখ বুজে বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর বাতরটা হৃদয়ঙ্গম হয়। ডিঙে জল বিভাজিকা দূরে রেখে এতদিন ও উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়েছে—অর্থাৎ কপার মাইনে উপত্যকার দিকে। এই প্রশস্ত ধীরস্রোতা নদীটি তাহলে কপার মাইন নদী। আর ওই উজ্জ্বল সাগরটি তবে সুমেক সাগর। জাহাজটা নিচুচু শিকারের, ম্যাক্কেই নদীর মুখ থেকে পূর্ব দিকে, অনেকটা পূর্বদিকে সরে এসে করোনেশান কাঁড়িতে নোঙর ফেলেছে। বহুদিন আগে দেখা হাডসনস বে কোম্পানির চাটের কথা মনে পড়ে, এ ব্যাপারে আর কোনো বিধা নেই। নিজের সিদ্ধান্তটা যুক্তিমাফিক বলেই মনে হয়।

উঠে বসে প্রয়োজনমাফিক জিনিসপত্র গোছানোর দিকে মনোনিবেশ করে। কপালের ফেটি দুটো ছিড়ে গেছে, পা দুটো আকারবিহীন কাঁচা মাংসের তালে পরিণত হয়েছে। শেষ কপালটাও গত। বন্দুক ও ছোরা দুটোই হারিয়েছে। তাছাড়া টুপিটা পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই কাঠিগুলোও লোপাট। তামাকের ধলিতে তেলা কাগজ মোড়া দেশলাই কাঠিগুলো বুকুর মধ্যে ঠিকই আছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্যাখে এগারোটা বেজেছে। ঘড়িটা এখনো চলছে। বোকাই যাচ্ছে সময়মতো দম দিতে ভুল হয় নি।

লোকটি এখন শান্ত, সুস্থির। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু কোন যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি নেই। ক্ষুধার্তও নয়। খাদ্যের চিন্তা আগের মতো আর ওর মনকে প্রলুব্ধ করছে না। যুক্তিহীন এলোমেলো চিন্তা আর ওকে কাবু করতে পারছে না। প্যাণ্টের তলার দিকে দুটো হাঁটুর কাছ থেকে কাপড় ছিড়ে নিয়ে পায়ের জড়িয়ে নেয়। যে করেই হোক টিনের প্যাটা কাছছাড়া হয়ে গেল। জাহাজ অভিমুখে থাকা শুরু করার আগে, খানিকটা পায়ের জড়িয়ে নেয় লোকটি, কারণ ও অনুমান করতে পারে এ যাত্রা হবে অত্যন্ত কষ্টকর এবং ভয়ানক।

অত্যন্ত ধীরে মৃদুর গতিতে পক্ষাঘাতগুস্তের মতো কাঁপতে কাঁপতে এগোতে থাকে। মাঝখানে একবার শুকনো শেঙা সপ্তাহ শুরু করার পর দ্যাখে যে আর উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নেই। বার বার চোটা করেও উঠে দাঁড়াতে পারে না। শেষ পর্যন্ত চার হাত পায়ের হামাগুড়ি দিয়েই এগোতে থাকে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে এক সময় নেকড়েটার কাছে গিয়ে পড়ে। অনিশ্চয়ভাবে জঙ্কট ওর পথ থেকে সরে আসে। জিত দিয়ে থাকাগুলো চাটতে শুরু করে। দেখে মনে হয় এমন শক্তিও নেই যে জিতটাকে মুড়বে। লোকটি লক্ষ্য করে যে নেকড়েের জিভটা সুস্থ স্বাভাবিক লাল রঙা নয়, হলদে খয়েরির মিশ্রণ, রক্ষ গোছের—আশ শুকনো শ্রেণায় ঢাকা।

দু-পাইটের মতো গরম লাল খাবার পর লোকটি দেখল ও দাঁড়াতে পারছে, হাঁটতেও পারছে, যদিও সেই চারপায়ে পায়ের মতো পথযাত্রীর শিথিলতা। মিনিটে মিনিটে দাঁড়িয়ে পড়ে বিশ্রাম নিতে হয়। পিছু পিছু নেকড়েটাও আসছে। ওর মতো নেকড়েটারও প্রতিটি পদক্ষেপ দুর্বল এবং অনিশ্চিত। রাশি নামে, অন্ধকারে ডুবে যায় বলমলে সমুদ্রটা। বৃকতে পারে সমুদ্রের দিকে চার মাইলের বেশি এগোতে পারে নি। সারারাত ধরে কানে আসে অসুস্থ নেকড়েটার দম বন্ধ করা কাশির শব্দ আর বলগা হরিণের ছানাদের কুঁই কুঁই ডাক। লোকটির চারপায়ে ঘিরে জীবনের ছাড়াছড়ি, তবে তা বড় কঠিন জীবন—অতি সক্রিয়, অতি সুস্থ। আর এই জনোই ও অসুস্থ মানুষটার পিছু ছাড়ছে না কিছুতে। কারণ নেকড়েটার অনুভূতি ওকে বলে দিচ্ছে মানুষটাই আগে মরবে—আর তখন....

সকালে চোখ মেলেতেই দ্যাখে নেকড়েটা সতৃষ্ণ ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে। গুড়িমুড়ি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। মরণাপন্ন যথো কুকুরের মতো লেজটা দুপায়ের মধ্যে ঢুক আছে।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় অসুস্থ নেকড়েটা কাঁপছে। লোকটি নেকড়েটাকে উদ্দেশ্য করে কী যেন বলে কিন্তু গলার কর্কশ স্বর ফিস্‌ফিসানির ওপরে ওঠে না। নেকড়েটা নিরুৎসাহী ভাবে দাঁত খিচায়।

উজ্জ্বল সূর্যের দেখা মিলেছে এবার সারা সকাল ধরে টলমলে পায়ের সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে—লক্ষ্য তার তিমি ধরা জাহাজটি। এগোতে এগোতে বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পরিস্কার আবহাওয়া। এই উচ্চ অক্ষাংশে সুন্দর দৃশ্যের মানচিত্র এত মেয়াদ ফুরাতে পারে। সপ্তাহে হতে পারে আবার কাল কিংবা তার পরদিনও এত মেয়াদ ফুরাতে পারে।

বিলম্বে ন্যাগাম লোকটি চলার পথে আরেকজন মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। বোকা যাচ্ছে লোকটি চার হাত পায়ের হামাগুড়ি দিয়েছে। বিলও হতে পারে বলে ওর মনে হয়। মনে হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু কোনো উত্তেজনা প্রকাশ পায় না। কোনো আগ্রহই নেই। বস্তুত ওর আর এখন আবেগ অনুভূতি বলে কিছু নেই। শারীরিক যন্ত্রণা অবধি টের পাবে

না। পেট এবং শ্রায়ুসমূহের নিদ্রামুগ্ধ অবস্থা, তবু দেহের অন্তর্বর্তী জীবনটুকু ওকে এখনো চালিত করছে। মরণের সঙ্গে যুঝে চলেছে। মরণে ও কিছুতেই রাজি নয় বলেই এখনো বিশ্বাস মাসকেণ বেরি এবং 'মিনো' খাচ্ছে, গরম জলটুকু নিয়মিত পান করছে। সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে অসুস্থ নেকড়েটার ওপর, যদি আক্রমণ করে বাসে।

চার হাল পায়ে আশুয়ান মানুষটির পদচিহ্ন অনুসরণ করে শিগিরাই ও অপরিচিত যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছায়—কতকগুলো হাড় চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মনে হয় অশ্লক্ষণ আগেই ভোজন পর্বটি সমাপ্ত করা হয়েছে। ভিত্তি শেওলার ওপর বহু নেকড়ের রয়েছে ধারার দাগ। হঠাৎ দেখে ওর হরিশের চামড়ার থলির জোড়টা পথের মধ্যে পড়ে পায়ের। তীক্ষ্ণ দাঁতের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন। লোকটির দুর্বল আঙুলের কমতা অনুযায়ী চামড়ার থলিটার ওজন খুব বেশি হওয়া সত্ত্বেও ওটাকে তুলে ধার। বিল এটাকে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে রেখেছিল। হাঃ—হাঃ। বিলকে দেখিয়ে দেবে, ওস্তাদের মার শেষ রাতে। ও ঠিক বেঁচে যাবে আর এটাকেও ঠিক বয়ে নিয়ে যাবে বলমলে সমুদ্রের বুকে নেভার ফেলা জাহাজটার। দাঁড়াকারের ডাকের মতোই লোকটির আনন্দের বীভৎস, কর্কশ প্রকাশ। নেকড়েটাও ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিশ্বাসক্রিষ্ট ভাবে গর গর করে। আচমকা লোকটি থমকে দাঁড়ায়—এই লালচে—পানা চাট্যাছোলা সাদা হাড়গুলোকে যদি বিল বলতে হয় তাহলে কী করে ওকে মজাটা টের পাওয়াবে? ঘুরে দাঁড়ায় লোকটি। দুর্বল পায়ে এগোতে এগোতে ভাবে—বিল ওকে পরিচয় করছেলি বটে, কিন্তু বিলের সোনা ও নেবে না, আর হাড়গুলো মুখে পুরে চুষবেও না। অবশ্য ওর জায়গায় বিল থাকলে এমন সুযোগ কিছুতেই ছাড়ত না।

এগোতে এগোতে একটা পুকুরের কাছে এসে পৌঁছায় লোকটি। মিনার ঝোঁকে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে এক বটকায মাথাটা সরিয়ে নেয়। জলে নিজের মুখের প্রতিফলন দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছে। ভয়ানক বীভৎস সে মুখ। সব কিছু অন্ধকার দ্বারা। বেশ কিছুক্ষণ পরে অচেতন্য ভাবটা কাটে। জল সেটা সম্ভব নয়, কারণ পুকুরটা যথেষ্ট বড়। টিনের পাত্রটা নিয়ে কয়েকবার মাছ ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে, তারপর আশা ছেড়ে দেয়। ভয় পায়, প্রচণ্ড দুর্বলতাবশত হুয়তো পড়ে যেতে পারে, ডুবে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। এই কারণে বালির চরে আটকেপড়া কোন কাঠের গুঁড়ি চড়ে ও নদী পেরোতে সাহস পায়।

জাহাজ আর লোকটির মধ্যকার ব্যবধান আজ তিন মাইল কমছে। পরের দিন হয়ত দুই মাইল হবে—কারণ ও এখন বিলের মতো হামাগুড়ি দিয়ে এগোছে। এই ভাবেই পঞ্চম দিনটি পেরোল, এখনো জাহাজ থেকে ওর দূরত্ব সাত মাইল। দিনে এক মাইল পথও পেরোতে পারছে না। ক্ষণস্থায়ী গ্রাম্য এখনও বিদায় নেয় নি। আবার লোকটি হামাগুড়ি দিতে শুরু করে। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারায়, জ্ঞান ফিরলে আবার হামাগুড়ি দেয়। অসুস্থ নেকড়েটা ওর পায়ে পায়ে যেন জড়িয়ে রয়েছে। 'কাশছে, হাঁপাচ্ছে আর অনুসরণ করছে। জামার পিছনের অংশ ছিড়ে নিয়ে হাঁটুর তলদেশে পাড়ের মতো জড়িয়ে নেওয়া সত্ত্বেও পা দুটোর মতো হাঁটু দুটোও দগদগে কাঁচা মাংসে পরিণত হয়েছে। পথের শেওলা আর পাথরের ওপর রক্তের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে লোকটি এগিয়ে চলে। হঠাৎ একবার পেছন ফিরতেই চোখে পড়ে ক্ষুধার্ত নেকড়েটা সেই রক্তচিহ্নগুলো জিত দিয়ে চেটে পিষাকার করে দিচ্ছে। বুঝতে ওর বাকি থাকে না, এখনই যদি ওটাকে হতম করে তেনা না পারে তাহলে অস্তিম পরিণতি কী হবে। এরপরই শুরু হয়ে যায় অস্তিত্বের লড়াইয়ের এক মর্মস্পর্শী নাটক। যার জুড়ি মেলা ভার। জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত একটি অসুস্থ লোক হামাগুড়ি দিচ্ছে,

হিংস্র আক্রোশে ঝুঁসছে আর অন্যদিকে এক ক্ষুধার্ত অসুস্থ নেকড়ে খোঁড়া পায়ে গুটিগুটি এগোছে। শিকারের এক উদ্ভাদ শোয়া দু-পক্ষই উদ্বীর্ণ। নির্জন প্রান্তরের মাঝ দিয়ে দুটি প্রাণী নিজ নিজের মৃতপ্রায় দেহদুটোকে টেনে নিয়ে চলেছে।

নেকড়েটা সুস্থ হলে ওর এত মাথা ঘামানোর কিছু থাকত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে দিয়ে এই মৃতপ্রায় ঘণা নেকড়েটা ওর ক্ষুধার্ত পেট ভরাবে, এ চিন্তা অত্যন্ত অস্বীকার্য। মনটা খুঁত খুঁত করছে। আবার চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ছে। কতগুলো মাসাদৃশ্য ওকে বিভ্রান্ত করে তোলে। এখন ও আর সুস্থভাবে কিছুই ভাবতে পারছে না। সুস্থভাবে চিন্তা করার অবকাশই পাচ্ছে না।

একবারে কানের কাছে একটা ফৌসফৌসানির শব্দে সম্ভিৎ ফিরে পায় লোকটি। নেকড়েটা লম্হচে পালানো গিয়ে পায়ের জোর হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বুঝি হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু একটুও মজা পায় না লোকটি, অবশ্য ভয়ও পায় নি। জীতি নামক পানাবৃত্তিকে সে কবে হারিয়ে বাসেছে। এই দৃশ্য ওকে সুস্থভাবে ভাবতে সুযোগ করে দেয়। শুয়ে শুয়ে তাই ভাবে, কী করা উচিত। এখান থেকে জাহাজটার দূরত্ব চার মাইলের বেশি নয়। চোখের জল মুছে তাকিয়ে এখান থেকেই জাহাজটাকে পিষাকার দেখতে পাচ্ছে আর সেই সঙ্গে দেখছে সাদা পাল তোলা একটি নৌকা বলমলে সমুদ্রের বুক চিরে এগাচ্ছে। কিন্তু এই চার মাইল পথ ওর পক্ষে যে কোনোভাবেই হামাগুড়ি দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয় তা ও জানে এবং জেনেও ও ওর কর্তব্য কর্মে অবিচল। ভালো করেই বুঝতে পারছে আর আশ মাইল পথও পার হতে পারবে না—তবু ও বিচ্যতে চায়। এতদিন ধরে এত সম্ভ্রমের মোকাবিলা করার পরও ওকে মরতে হবে মরতে হবে একথা ও মানতে রাজি নয়। তাছাড়া এটা অযৌক্তিক। মানুষটির ওপর দুর্ভাগ্যের দাবির যেমন অন্ত নেই, তেমনি সেও কিছু কম যায় না। অবশ্যজ্ঞানী মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে মৃত্যুকে অস্বীকার করছে।

চোখ বুঁজ অতি সতর্ক ভাবে নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনে। তীরের ওপর আছড়ে পড়া উত্তাল ঢেউয়ের মতো ওর অন্তিভয়ের রক্তে যে শাসরোমকারী অবসন্নতা ক্রমশ ওকে আঘাত হানছে তার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করে ও জয়ী হতে চায়। বিচারে সংগ্রামে মরণকে অস্বীকার করতে চায়। এই মারাত্মক অবসন্নতার প্রকৃতি সমুদ্রের মতো, ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে উঠে চৈতন্যকে গ্রাস করে। কখনো কখনো ও নিমজ্জিত হয়ে পড়ে অবসন্নতার সমুদ্রে, বিশ্বস্তির অতলে তখন এলোমেলো ভাবে হাত-পা ঝুঁড়ে সীতরায়। আবার কখনো অজ্ঞাত আবৃত্ত প্রাণ-রসায়নের দৌলতে মনোবলের গুণগারীশে ফিরে পায় এবং আবার উদ্যমে রুখে দাঁড়ায়।

লোকটি একেবারে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকে, অসুস্থ নেকড়েটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে, হাঁসফাঁস শব্দ থেকেই টের পেয়েছে। মনে হয় অনন্ত কাল ধরে ওটা ক্রমশ কাছের এগিয়ে আসবে। লোকটি একটুও নড়ে না। কখনো গোড়ায় এসে পৌঁছেছে নেকড়েটা। গালের ওপর জন্তুটার কর্কশ জিভের স্পর্শ শিরিশ কাগজ ধমার মতো লাগে। ঝাঁটতে দুটো হাত প্রসারিত করে—ওর নখগুলো বাজপাখির ফলার মতো তীক্ষ্ণ। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, মঠের মধ্যে শুধু ধানিকটা বাতাস আঁকা পড়ে।

সাংঘাতিক বৈধ নেকড়েটার। অবশ্য লোকটির বৈধও কিছু কম নয়। দিনের অধেকটা নিশ্চলভাবে শুয়েই কাটিয়ে দেয়। বাত না বেঁধেই হয়ে পড়ে তার জন্মে ক্রমাগত নিজের সঙ্গে লড়াই করে চলে। প্রতীক্ষা করে, কখন নেকড়েটা ওকে শেতে আসে এবং শেষ পর্যন্ত ওরই খাদ্য হয়। কখনো কখনো লোকটি অবসন্নতার অতলে তলিয়ে যায় এবং সুদীর্ঘ সব

স্বপ্ন দেখে, কিন্তু এই নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যেও লোকটি সদা প্রতীক্ষারত। শুধু ভাবে এই বৃষ্টি কানের কাছে নিশ্বাসের শব্দ শুনল, এই বৃষ্টি কর্কশ জিভটার সাহায্য স্পর্শ ওকে আতঙ্কিত করে তুলল।

নিশ্বাসের শব্দটা কিন্তু লোকটি শুনতে পায় নি, তখন ও স্বপ্ন দেখছিল। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তন্দ্রা কেটে যায়, বুঝতে পারে নেকড়েটা জিভ দিয়ে হাত চাটছে। লোকটি সুযোগের অপেক্ষা করে। খাবাগুলো আলতোভাবে চাপ দিচ্ছে। চাপটা আরো বাড়ে। নেকড়েটা সুদীর্ঘকাল যার জন্যে প্রতীক্ষা করেছে, সেই খাদ্যের গুপের দাঁত বসাবার চেষ্টায় সব শক্তিটুকুকে সমস্ত ব্যবহার করছে। লোকটিও দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করেছে। এবার ওর রক্তচাপ দম্বদ্বিধী হাতখানা নেকড়েটার চোয়ালটাকে চেপে ধরে। নেকড়েটা দুর্বলভাবে যুক্ত—আর লোকটিও দুর্বলভাবে মুঠো পাকিয়ে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত লোকটি ধীরে ধীরে অন্য হাওয়া দিয়ে নেকড়েটাকে প্যাঁচ ফ্যালো। মিনিট পাঁচকে পেরোবার পর দেখা যায় লোকটির পুরো দেহের ওজনের তলায় নেকড়েটা পিষ্ট হচ্ছে। নেকড়েটাকে যে টুট টিপে মারবে, ওর কজিতে সে জোর নেই। শেষ পর্যন্ত লোকটি দাঁত বসিয়ে দেয় নেকড়ের গলায়। মুখ ঢেকে গেছে বড় বড় লোমে। আঘ ঘটানোকে পর লোকটি বুঝতে পারে গলা দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে উষ্ণ রক্ত নামছে। অনুভূতিটা সুখপ্রদ নয়। এ যেন গলিত সীসা গিলতে বাধ্য হওয়া। আর এই বাধ্য হবার পেছনে রয়েছে তার নিজেরই প্রতিজ্ঞা। স্থানিকটা পরেই লোকটি টিং হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

তিমি শিকারের জাহাজ বেডফোর্ড—এ ছিলেন কজন বিজ্ঞানী। ওদের দল বৈজ্ঞানিক পর্যটনে বেরিয়েছে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা তীরের কাছে আত্মত একটা জন্তু লক্ষ্য করেন। জন্তুটি তীর বেয়ে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছে। এটি যে কী তা তাঁরা অনুমান করতে পারেন না। ওরা তখন জাহাজের সঙ্গে লাগোয়া একটি নৌকায় চড়ে বসেন। অনুসন্ধান করতে তীরের দিকে রওনা দেন। তীরের ওপর যাকে ওরা পড়ে থাকতে দেখলেন তার প্রাণ আছে বটে, কিন্তু তাকে মানুষ বলা খুব শক্ত। লোকটি অন্ধ, বেইশ। কীটের মতো মাটির ওপর কিলবিল করছে। এগোবার জন্যে এই দুঃসাহায্য প্রচেষ্টা বহুলাংশেই বিফল হচ্ছে তবু লোকটি নাছোড়বান্দা। লোকটি খণ্ডা পিছু কুড়ি ফুটও বোধহয় এগোতে পারছিল না।

তিন সপ্তাহ পরে লোকটি বেডফোর্ড—এর একটি শয্যা শুয়ে বলবার চেষ্টা করছিল, সে কে এবং কেন সে এখানে এসেছিল। ওর হাড় বার করা গাল বেয়ে অব্যবহৃত বারছিল অশ্রু। ওর অসংলগ্ন অনর্গল কথা থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছিল যে লোকটি তার মায়ের কথা বলছে। সূর্যকরোজ্জ্বল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার কথা আর কমলালেবুর বাগান ঘেরা ছোট্ট একটা বাড়ির কথা।

এরপর খাবার টেবিলে বিজ্ঞানী ও জাহাজের অফিসারদের সঙ্গে যোগ দিতে ওর আর বেশিদিন সময় লাগে না। খাদ্যসম্ভারের বহর দেখে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে লোকটি। অন্যরা খাবার ভুলে মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ভিগ্ন দেখায়। এক এক গ্রাস খাদ্য অনুশ্য হয় আর অমনি ওর দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে এই গভীর অনুতাপ।

লোকটি এখন পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ বটে কিন্তু খাবার সময় ও এদের কাউকে সহ্য করতে পারে না। মজুত বাদ্য ফুরিয়ে যাবার আতঙ্ক ওকে যেন পেয়ে বসেছে। পাচক, কেবিন বয় আর ক্যান্টেন-ভাঁড়ারের কতটা কী আছে না আছে প্রত্যেকের কাছে খোঁজ নিয়েছে। বারবার আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও ওদের কথা বিশ্বাস করতে পারে না। নিজের চোখ দেখবে বলে

চোরের মতো ভাঁড়ারের আশপাশে ছুঁক ছুঁক করে বেড়ায় লোকটি।

লোকটি দিন দিন মোটা হতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানীরা চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং ওর জন্যে বরাদ্দ খাদ্যের পরিমাণটা কমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তবু ওর পেটের বহর দিন দিন বাড়তেই থাকে—সার্টের তলায় বিশ্ময়করভাবে উঁচুটা ফুলে ওঠে। নাবিকরা মিটিমিটি হাসে। ওরা ব্যাপারটা জানে। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিন চোখে চোখে রাখার পর বিজ্ঞানীরাও ব্যাপারটা জানলেন। ওরা দেখলেন, প্রাতরাশের পর লোকটি ভিক্ষুকের মতো ঝুঁকে পড়ে একজন নাবিকের সামনে হাত বাড়িয়ে ধরলো। নাবিকটি হেসে জাহাজি বিস্কুটের এক টুকরো ওকে দিল। লোভীর মতো ও মুঠো করে ধরে বিস্কুটটা আর এমনভাবে চেয়ে দ্যাখে যেন মনে হয় সে এক কপণ সোনার তালের সন্ধান পেয়েছে। তারপর সার্টের তলায় বিস্কুটটা লুকিয়ে ফেলে। অন্য নাবিকরাও হাসতে হাসতে ওকে বিস্কুট দেয়। বিজ্ঞানীরা কথটা জানতে পেরেও চেপে গেলেন। লোকটিকে ওরা ধাঁটলেন না কিন্তু গোপনে ওর শোবার ব্যাগে তল্লাশি চালান। দেখা গেল জাহাজি বিস্কুটে বাস্ত ভর্তি, জাহাজি বিস্কুটে গিঠ দাসী, প্রতিটি আনাচে কানাচে গোঁজা রয়েছে জাহাজি বিস্কুট। অথচ লোকটি অপ্রকৃতিস্থ নয়। সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে মাত্র। বিজ্ঞানীরা বললেন, এটা সাময়িক। সানফ্রান্সিসকো বেতে বেডফোর্ড নোভর ফেলার আগেই বিজ্ঞানীদের কথা সত্যি প্রমাণিত হল।

বিধর্মী

প্রাচ্য ও ভূমধ্যের মধ্যে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। যদিও একই জাহাজে আমরা সেই বছর থেকে রেহাই পেয়েছিলাম, তবু প্রথম তার ওপর আমার দৃষ্টি পড়েছিল দুই মাস্তুলঅলা জাহাজটি আমাদের পায়ের নিচে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর। জাহাজের ওপরে অন্যান্য কানাকা মাল্লার সঙ্গে আমি হযত তাকে দেখে থাকব কিন্তু 'পেটি জেন'-এর অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে তার কথা মনে করে রাখবার দরকার পড়ে নি। আট-দশজন কানাকা নাবিক, শ্বেতাঙ্গ ক্যাপ্টেন, যেট এবং মালবাবু আর কেবিনের ছয়জন যাত্রী ছাড়াও পঁচাত্তি জনের মতো পমোতান আর তাহিতিয়ান নারী-পুরুষ-শিশু আরোহী নিয়ে 'পেটি জেন' রসিরোয়া থেকে যাত্রা করেছিল। এদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করে কারবারি বাক্স, শোবার মাদুর ছিল। কাম্পল আর কাপড়চোপড়তো ছিলই।

পমোতায় মুক্তল সংগ্রহের মৌসুম শেষ হয়েছে। সবাই ফিরে যাচ্ছে তাহিতিতে। আমরা ছ'জন কেবিন যাত্রী মুক্তার কারবারি-মুক্তার জেতা আমাদের মধ্যে আছে দুজন আমেরিকান, আহুতুন নামে একজন চীনা (এমন শ্বেতাঙ্গ চীনা আমি কখনো দেখি নি), একজন জার্মান, একজন পোলান্ডীয় ইহুদি আর আমি-সব মিলে একেবারে আধভজন।

এবারকার মৌসুমটা ছিল লাভজনক। কি আমরা, কি পঁচাত্তি জন ডেক আরোহী, কারোই কোনো অভিযোগ নেই। সবাই ভালো কারবার করেছে। একটু বিশ্রাম নিতে জাহাজে থামবে পাণ্ডিত্যে। সেখানে কিছু সময় আনন্দে কাতানোর আশায় সবাই আগ্রহে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

বাস্তবিকই, জাহাজটি মাত্রাতিরিক্ত বোকাই করা হয়েছিল। 'পেটি জেন'-এর ক্ষমতা সস্তর টন। কিন্তু তার ওপর যত লোক উঠেছে, সত্যি বলতে কি, তার দশ ভাগের এক ভাগ বহন করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য। পাটাতনের নিচের জায়গাটা নারকেলের শুকনো শাঁস আর বিনুকে ঠাসাঠাসি করে বোকাই করা, একতিল ফাঁক নেই। দোকানঘরটাও বিনুকেই ভর্তি। মাল্লারা যে কিভাবে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এটাই ভাববার মত। ডেকের ওপরে নড়াচড়ার কোনো সুযোগ নেই। গরাদ ধরে ধরে অবলীলায় তাদেরকে ওঠানামা করতে হচ্ছে।

রাত্রিবেলা মাল্লারা ঘুমন্ত মানুষগুলোর ওপর দিয়েই হেঁটে গেছে। কী বলব, সেই ডেকের ওপর আবার শূয়ের ছানা, মুরগির দায়া আর সরকারদের বস্তাও রাখা হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকটা আপাত ফাঁকা জায়গায় ডাবের মালা আর কলার হাড়ি সাজিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনের এবং প্রধান পালের টানার মধ্যে উভয় দিকেই নিচু করে অনেকগুলো দড়ি টাঙানো হয়েছে যাতে সামনে পালদা ঘুরতে বাধা না পায়। আর এই সব দড়িরা প্রত্যেকটাতে অন্তততপক্ষে পঞ্চাশ ছড়ি করে কলদা কুলেছে।

আমাদের যাত্রাপথ নিরুপদ্রব নয় বলেই মনে হল, যদিও দক্ষিণ পূর্ব বাণিজ্য বায়ু ঠহলে আমরা দু-তিনদিনেই সে পথ অতিক্রম করতে পারি। কিন্তু সে সুযোগ হল না। প্রথম পাঁচ ঘণ্টার পর দশ-বারোবার দমকা হাওয়া দিয়ে সেই বাণিজ্য বায়ু দূরে হারিয়ে গেল। তারপর একেবারে শুষ্ক হয়ে রইল অব্যবহিত প্রকৃতি। সমস্ত রাত এবং পরবর্তী

সমস্ত দিন ধরে একটা গুমোট নিস্তব্ধতা বিরাজ করল। এ সেই চোখ-ধাঁধানো স্বচ্ছ গুমোট প্রকৃতি-আর দিকে তাকানোর কথা ভাবলেই মাথা ধরে যায়।

দ্বিতীয় দিন একজন মারা গেল। ইন্টার দ্বীপের অধিবাসী ছিল লোকটা। সে মৌসুমের শ্রেষ্ঠ লেগুন ডুবুরিদের একজন। জানতে পারলাম তার গুমিবসন্ত হয়েছিল। কিন্তু আমার ধারণাতেই এল না, আমাদের জাহাজে এই রোগটা কী করে আসতে পারে। কারণ, রসিরোয়া থেকে যখন আমরা যাত্রা করি তখন সেখানকার উপকূল অঞ্চলে এই রোগের কোনো প্রমাণ পাই নি। তবু সেই বসন্তেই একজন মরল এই জাহাজে এবং আরো তিনজন আজ্ঞাত হয়ে মারা গিয়েছে।

করার কিছুই ছিল না। না আমরা রোগীদেরকে আলাদা রাখতে পারছিলাম, না তাদের কোনো সেবা করতে পারছিলাম। সার্ভিন মাছের মতো গাদাগাদি করে আছি সবাই, ঐ অবস্থায় পচে মরা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। প্রথম লোকটা মারা যাবার পর যে রাত এল সে রাতের পরেও আমরা কিছু করতে পারলাম না। সে রাতেই যেট, মালবাবু, সেই পোলান্ডীয় ইহুদি এবং চারজন দেশীয় ডুবুরি তিমি শিকারের বিরাট একটি ডিঙিতে করে সরে পড়ল। পরে তাদের আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন অবশ্য অবশিষ্ট সব ডিসা ফুটো করে একেজো করে দিল ফলে। আমরা সেখানেই রয়ে গেলাম।

পরের দিনই মারা গেল দুজন, তার পরদিন তিনজন, তারপর সেই সংখ্যা লাফিয়ে আটে উঠল। আমরা যে কীভাবে হিরি থাকতে পারলাম ভাবতে আশ্রয় লাগে। নেটিভদের কথাই ধরা যাক; আতঙ্কে ওদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, বোবা হয়ে গিয়েছিল ওরা। জাহাজের কার্য ক্যাপ্টেন-নাম ওদোজে-ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করল। অন্তত দুশো পাউন্ড ওজনের তার বিরাট মামেল বণু, দেখতে দেখতেই তা সে থলথলে চর্বির একটি কম্পনান শব্দে রূপান্তরিত হয়।

সেই জার্মান ভ্রমশাল, আমি আর আমেরিকান দুজন মিলে সব কটা স্কচ-হুইস্কির বোতল কিনে এনে প্রচুর মদ খেতে লাগলাম। মাতাল হয়ে বাঁচার প্রয়াস। প্রয়াসটা সুন্দর-ভাবটা এমন আমরা যদি মদে ডুবে থাকতে পারি তাহলে প্রতিটি বসন্তের জীবাণু আমাদের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে অঙ্গার হয়ে যাবে, এতে অবশ্য কাজও হল। অবশ্য ক্যাপ্টেন ওদোজে আমরা আহুতুন কেউই সে রোগে আক্রান্ত হয় নি। ফরাসি ক্যাপ্টেন তো মোটেই মদ খেত না, আর আহুতুন সারাদিনে মাত্র একবার।

ষষ্ঠটা সুন্দর। উত্তরায়নগামী সূর্য ঠিক মাথার ওপর। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস ছাড়া কোনো হাওয়া নেই। পাঁচ মিনিট থেকে আধঘণ্টা স্থায়ী এই দমকা বাতাস তীব্রভাবে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হয় এবং আমরা ভিজতে থাকি। তারপর আবার মেঘের ভিতর থেকে প্রকাশ সূর্য বেরিয়ে আসে। প্রতিটা ঘটকার পরে প্রব্রের রৌদ্রের তাপে ভেজা পাটাতন থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ভাপ ওঠে।

তাঁপটা অসহনিক। লক্ষ লক্ষ জীবাণু ভর্তি মৃত্যুর দূত মনে। সেই ভাপ কোনো মুখবু কিংবা মৃতের লাশের ওপর দিয়ে উঠতে ছাড়া আমরা আরেকবার বেশ করে পান করে নিই। তাছাড়া, যখনই ওরা জাহাজের চারদিকে জড়ো হওয়া হাঙরগুলোর মুখে লাশ ছুঁতে ফেলে তখনই পানের মাত্রা চড়িয়ে দেওয়াটা আমরা নিয়মসিদ্ধ করে নিয়েছি।

এমনিভাবে এক সপ্তাহ চলল। একসময় হুইস্কি ফুরিয়ে গেল। জিনিসটা সত্যিই ভালো ছিল, নিলে আঙ্গ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকতাম না। এটাই আমার মত একজন নির্জীব

মানুষকে সকল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পেরিয়ে আসার উদ্যম দিয়েছিল। অসংখ্য মৃত্যু অতিক্রম করে মাত্র দুজন লোকই শেষ পর্যন্ত নিজদের বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের সেই ছোট কাহিনীটা বর্ণনা করলে কথাটা আপনিও মানবেন। দুজনের একজন সেই বিধর্মী। আমি যখন তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম তখন ক্যাপ্টেন ওদোজে ও নামেই তাকে ডাকল। যাক, এবার আগের কথায় ফিরি।

সপ্তার শেষ। হুইলস্কি ফুরিয়ে গেছে। মুক্তার কারবারিরা নির্ভীব হয়ে কিমোচ্ছে। আমি কেবিনের সরু করিডোরে বুলন্ত ব্যারোমিটারের দিকে ঘন ঘন তাকাছি। পমোতানে এর স্বাভাবিক স্থিতি ছিল ২৯.৯০৫টা। এরমধ্যে আমরা ২৯.৮৫ থেকে ৩০.০০ এমন কি ৩০.০৫-এর মধ্যে পারদের ওঠানামা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ ২৯.৬২তে পারদ নেমে আসতে দেখলে স্ফট-হুইলস্কিতে বসন্তের জীবাণু পুড়িয়ে নেয়া সব চাইতে মাতাল ব্যক্তিরও মাথা ঠাণ্ডা হতে বাধ্য। আমি তাই দেখলাম।

ক্যাপ্টেন ওদোজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম সেইদিকে। তাকে শুধু জানালাম ব্যাপারটা। সেও কয়েক ঘণ্টা ধরে পারদের নেমে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করল। অবশ্য করবার ছিল সামান্যই। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্যাপ্টেন সেই সামান্যটুকুই ভালোভাবে সমাধা করল। ছোট পালগুলো নামিয়ে ছড়িয়ে জেনো সব পাল নিয়ন্ত্রিত মাগে গুটিয়ে আনল এবং 'লাইফ লাইন' হাতের কাছে ছড়িয়ে নিয়ে বাতাসের জেনো অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বাতাস আসার পরই ভুল করে বসল ক্যাপ্টেন। বাতাসের মুখে পালের ওপর নির্ভর করেই গতি ফিরিয়ে নিল। বিঘ্নবেরাধর দক্ষিণ থাকলে এবং সরাসরি ঝড়ের মধ্যে না পড়লে সামনের বাধা অতিক্রমের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা ফলবর্তী হত।

কিন্তু হাওয়ার বেগের ক্রমান্বিত আর তার সঙ্গে ভাল রেখে ব্যারোমিটারে পারদের ক্রমান্বিত আমাকে স্পষ্ট ধারণা দিল যে আমরা সরাসরি ঝড়ের মুখই আছি। ক্যাপ্টেনকে বললাম: জাহাজ ঘুরিয়ে বাতাসের অনুকূল চলিয়ে দাও; তারপর ব্যারোমিটারে পারদের নেমে আসা বন্ধ হয়ে গেলে তেঁকে রক্তা হওয়া হবে। কিন্তু সে আমার সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিল এবং তর্ক করতে করতে হিন্দিয়া রোগীর মতো বিচিয়ে উঠল, তবু তার নিজের সিদ্ধান্ত থেকে নড়ল না একটুও। সব চাইতে দুঃখ পেলাম এজন্য যে মুক্তার কারবারির কাউকেই আমার সমর্থনে পেলাম না। আমি জানতাম তারা সন্দেহ করছে, আমি সমুদ্র আর সমুদ্রের পথটাই সম্পর্কে আদৌ কিছু জানি কিনা? ঠিকই তো, একজন যোগ্য এবং অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনের চেয়ে এব্যাপারে বেশি জ্ঞান আমার কী করে থাকতে পারে?

বাতাসের বেগের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র ভয়ঙ্করভাবে ফুলে ফুলে উঠল। 'পেট জেন' যেভাবে প্রথম তিনটি উত্তাল তরঙ্গ পেরিয়ে এসেছিল তা আমি কোনোদিন ভুলব না। বাইরের ছোট নৌকার মতো বিশাল জলরাশির আঘাতে প্রথমে সে ছিটকে গেল। প্রথম তরঙ্গের ধাক্কাটা তো তাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল। নারী আর শিশু, কলা আর ডাব, শূকর ছানা আর বাস-পেঁটার, রোগী আর মূর্খ সব এক সঙ্গে যন্ত্রণার টিংকার করতে করতে ফুঁসে ওঠা জলরাশিতে ভেসে গেল। 'লাইফ লাইন'ের সাহায্য নিতে পারল শুধু শক্ত সমর্থ কজন।

দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রবল দাপটে পেটি জেনের ডেক দুপাশের গরাদ পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে গেল। পছেন্টা ডুবে গেল জলের মধ্যে। সামনের গলুই উচিয়ে উঠল আকাশের দিকে। দূর্দাগ্রস্ত জীবন আর মালগণ সবই পেছন দিয়ে সমুদ্রে গড়তে লাগল। এ যেন মানুষেরই

একটা দলপাকানো প্রপাত। কেউ সামনে মাথা দিয়ে, কেউ পা দিয়ে, কেউ আড়াআড়ি একের ওপর এক ঘুরপাক খেতে খেতে গড়িয়ে আসতে লাগল। যাঁতা খেতে খেতে, মোচড়তে মোচড়তে, হুমড়ি খেতে খেতে ওরা গড়াগড়ি খেল। বার বার তারা মুক্তি করে চলে ধরতে চাইল কুলন্ত রশি, কিন্তু শরীরের ওজন তো শিথিল হয়ে যেতে লাগল।

একজনকে দেখলাম উঠে এসে গুতো খেল খেলের শক্ত পাটাতনের বাঁজ—এক সঙ্গে মাথায় আর কাঁধে। একটা ডিমের মতো ভেঙে গেল তার মাথাটা। ধাবমান তরঙ্গের রপটটা আমি দেখতে পেলাম! লাকিয়ে উঠে গেলাম কেবিনের ছাদে এবং সেখান থেকে মূল বাদামের মান্ডলের খেলে। আহুত্ন এবং দুজন আমেরিকানদের একজন আমাকে অনুসরণ করছিল কিন্তু আমি গুদের থেকে একধাপ এগিয়ে ছিলাম। আমেরিকানটা একটা কুটোর মতো জাহাযের পেছন দিয়ে ভেসে গেল। আহুত্ন জাহাজ চালানোর চাকর একটা শিক ধরে খুলতে লাগল। কিন্তু সেখানে পেটি বাঁধা একজন রারেটাসার মেয়েমানুষ (চলতি ভাষায় এদের 'ওয়ানীয়া বলে')—ওজন অন্তত আড়াইশো পাউন্ড হবে—আহুত্নের মুখেমুখি হয়ে একহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল, অন্য হাতে জড়িয়ে ধরল হালের কানাকা নাবিককে।

লাশ আর তরঙ্গের প্রবল স্রোত কেবিন আর ধারের মধ্যবর্তী মাল নামানোর ফাঁকা জায়গার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, হঠাৎ স্রোতের গতি খেলের দিকে ঘুরে গেল। 'ওয়াহিন', আহুত্ন আর সেই হালের মালা—সব একসঙ্গে ভেসে গেল সমুদ্রে। আমি নিশ্চিত দেখলাম গরাদ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যাবার সময় আহুত্ন আমার দিকে হতাশ দার্শনিকের মতো তাকিয়ে কাঁদাশ্বাস হাসল।

তৃতীয় তরঙ্গ—টোটার মধ্যে বৃহত্তম সে তরঙ্গ, অবশ্য আমাদের আর বেশি কিছু ক্ষতি করতে পারল না। যখন চেষ্টাটা এল তখন সবাই মৃত্যুর কথাই ভাবছে। ডেকের ওপর গ্রায় ডজন খানেক অধর্মিগ, অর্ধচেতন মানুষ খাবি খেতে খেতে গরুচ্ছে কিংবা বুকে হেঁটে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অবশিষ্ট নৌকা দুটোর ভগ্নাবশেষের মধ্যে তেই তারা খেলার পাশ দিচ্ছে গড়িয়ে গেল। অন্যান্য মুক্তা কারবারিদের সঙ্গে আমি ডেউ আসার বিরতিতে পনেরজনের মতো নারী ও শিশুক উদ্ধার করে কেবিনে আটকে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ব্যবস্থা তাদের কোনো উপকারেই লাগল না।

আর বাতাস? বাতাস যে এত বেগে বইতে পারে আমার সব অভিজ্ঞতা একসঙ্গে করেছে তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এর কোনো বর্ণনা দেয়া যায় না। নিশীথ রাত্রির দুঃস্থপুকে কি কেউ বর্ণনা করতে পারে? ঝড়টাও ছিল তেমনি দুঃস্থপুের মতো। সে বাতাস আমাদের শরীর থেকে সমস্ত কাপড় ছিড়ে নিয়ে গেল। আমি বলি না এসব বিশ্বাস করুন; আমি যা দেখেছিলাম এবং অনুভব করেছিলাম তাই শুধু বলছি। মাঝে মাঝে আমিও এখন সে সব কিছু বিশ্বাস করতে উঠতে পারি না। তবু আমি তার মধ্যে পড়েছিলাম এবং এটাই আসল কথা। সে বাতাসের মুখোমুখি পড়লে কেউ বাঁচতে পারে না। সে যেন এক মহাগ্রনলের তাণ্ড। তবে সবচাইতে ভয়ঙ্কর অবস্থা হল এই যে সে বাতাসের বেগ বেড়ে গেল এবং ক্রমাগত বাড়তেই লাগল।

ধরুন, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টন বালু এবং সেই বালু ঘটায় নবহই, একশো, একশো কুড়ি মাইল কিংবা তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি বেগে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উড়ে চলেছে। আরো মনে করুন সে বালু অদৃশ্য, সূক্ষ্ম কিন্তু তাতে বালুর স্বাভাবিক ভার ও ঘনত্ব বিদ্যমান। এই সমস্ত কিছু ভাবুন, তাহলেও হয়ত সেই বাতাসের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পেতে পারবেন।

হুহুত বালু দিয়ে তার সঠিক উপমা দেওয়া গেল না। মনে করুন, কাঙ্গা—অদৃশ্য, অতি সূক্ষ্ম কিন্তু কাগার মতোই ভারী কিছু। না, এ তার চেয়েও বেশি। মনে করুন, বায়ুর প্রতিটি পরমাণু যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে সে কাগার স্তূপ। এখন ভাবুন সেই কাগার স্তূপের ঘনত্বের বিপুল চাপ কবির লি। আরো মনে হলে, সেই প্রচণ্ড বাড়ের ঘূর্ণবর্তকে সমগ্র জলরাশি শুষে নিয়ে বাতাসের জায়গা দখল করতে যেন শূন্যে উড়ে মারছে। আমাদের পালের ক্যানভাস অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ‘পেট্রি জেন’ জাহাজে ক্যান্টেন ওর্দোজের একটা অদ্ভুত নোঙর ছিল। সন্ডিথ সির জাহাজগুলোতে আমি এ ধরনের নোঙ্গর কোনোদিন দেখি নি। ত্রিকোণ একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। মুখে বিরাট একটা লোহার বালা লাগানো—তাতে লাগাম—মুখটা সব সময় খোলা থাকে। সেই নোঙরের সঙ্গে বুড়ির মতো লাগাম বাঁধা—যাতে সবচেয়েই স্টো জল কেটে যেতে পারে, বুড়ি যেমন করে বাতাস কেটে আকাশে গুঁঠে তেমনিভাবে। অবশ্য এই কেটে চলার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। জাহাজের সঙ্গে একটা লম্বা দণ্ডিতে বাঁধা নেওড়াগুলো সমুদ্রতলের একটু নিচে খাড়া হয়ে থাকত। ফলে সেই বাড়ের তরঙ্গের মুখে ‘পেট্রি জেন’ গলুই উচিয়ে চলতে লাগল।

বাড়ের মুখে না গড়লে আমাদের কিছুই হত না। বাড় আমাদের পালের ক্যানভাসগুলো ছিড়ে নিয়ে গেল, মাষ্টলগুলোর মাথা থর থর করে কাঁপিয়ে জাহাজ চালানোর যন্ত্রটার সঙ্গে রীতিমতো খেলা শুরু করে দিল। তবু আমরা হয়ত ভালোভাবে আসতে পারতাম কিন্তু বাড়ের কেন্দ্রেবিন্দু এগিয়ে এসে আমাদের বোধহয় চারদিক থেকে বেঁধে ফেলল। আমি যেন খেঁই হারিয়ে ফেললাম। পঙ্গুর মতো নিঃশব্দ হয়ে পড়লাম আমি, বাতাসের আগের চাপ অনুভবের সব ক্ষমতা চলে গেল। মনে পড়ে যায় সেই অদ্ভুত থেকে যখন চূড়ান্ত বোধাত এসে লাগল তখন আমি সব আশা ছেড়ে দিয়ে মরতেই চলেছিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধাক্কাটা এল অন্যভাবে। টের পেলাম একটা দম আঁটকানো ধমকো ভাব। অনুভব করলাম আমাদের চারপাশে, নিশ্বাস নেবার মতোও হাওয়া যেন নেই কোথাও। ফলে মড়ার মতো পড়ে থাকা ছাড়া উপায় রইল না।

সেই ভয়ঙ্কর চাপের মধ্য থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা নিদারুণ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করলাম। তারপর হঠাৎ একসময় বাতাসের চাপ কমে গেল। মনে আছে তখন কি দেখে নিস্তার করে চারদিকে উঠে যেতে উঠেছে করছিল আমরা। মনে হল আমার দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু একে অন্যর সঙ্গে সর্ব্বার্থ শুরু করেছে, মুহূর্তের অবকাশে অব্যাহত গতিতে উড়ে যেতে চাইছে মহাশূন্যে। কিন্তু এমন অবস্থা বেশিক্ষণ রইল না। আমাদের ওপর তখন ধ্বংস নেমে আসছে।

বাতাসে চাপ না থাকায় সমুদ্রের জল ফুলে উঠল। লাফাতে লাগল তরঙ্গের পর তরঙ্গ এগিয়ে এল। ফাঁসে গুঁটা সমুদ্রের জলরাশি যেন উড়ে যেতে চায় আকাশের মেঘের কাছে। জলের বালতির তলা থেকে কাক ছেঁড়ে দিল যেমন ছিটকে গুঁঠে তেমনি ছিটকে উঠেছে ডেউগুলো। কোনো নিয়ম নেই, কোনো স্থিতি নেই সেই ফাঁকা, উন্মুক্ত সমুদ্রতরঙ্গের। কমপক্ষে আশি ফুট উঁচু হয়ে আসছে। এ যেন ভরসই নয়। মাথের দেখা কোনো তরঙ্গের মতোই নয়।

এক—একটি ঢেউ যেন এক—একটি জলের কিংবা কানার আছড়ে পড়া স্তূপ। হ্যা, বিশাল স্তূপ—আশি ফুট উঁচু। আশি। না, তারও বেশি হবে। আমাদের মাষ্টলের চেয়েও উঁচু। ক্ষিপ্ৰগতি, বিস্ফোরক, প্রমত্ত। যখন খুশি তখনই উর্ধ্বে উঠে যেখানে খুশি সেখানে ভীষণ শব্দে ভেঙে পড়ছে। পরস্পরকে আঘাত করছে। দুটি ঢেউ প্রবল বেগে পরস্পরের দিকে ছুটে এসে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে কিংবা সর্ব্বার্থের পর সহস্র প্রপাতের মতো দুদিকে ছিটকে পড়ছে।

সেই প্রচণ্ড বাড়ের মহাসমুদ্রকে কল্পনা করাও কঠিন। এ যেন একটা আন্টি, বার বার মনকে বিক্রমে ফেলে। এ যেন এক যোরা অরাজকতা, এ যেন নরকের অতললম্পর্ষ গহবরে উন্মত্ত সমুদ্রের বিপুল বিক্ষোভ।

আর সেই ‘পেট্রি জেন’ জাহাজ? আমি বলতে পারব না। পরে সেই বিধর্মী বলেছিল, সেও জানে না ‘পেট্রি জেন’র কথা। হয়ত ভেঙে গেছে। খুল পড়েছে তার সারা শরীর। হয়েছে কোনো ভেসে যাওয়া গাছের গুঁড়ির সঙ্গে আঘাত খেয়েছে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি সমুদ্রের মধ্যে পড়ে তখন প্রাণপণে সঁাতরাছি। একরকম ভুবেই গিয়েছিলাম আমি। এ অবস্থায় যে কী করে রক্ষা পেলাম মনে করতে পারছি না। তবে আমার মনে আছে, যখন নিজের চোখে ‘পেট্রি জেন’কে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখলাম তখন আমার ভেতর থেকে সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। শেষ চেষ্টা করলে বিলম্ব করলাম না কিন্তু তাতে কোনো আশার আলো দেখানো না। আবার বাতাস বইতে শুরু করল। ডেউগুলোকে তখন ছোট আর নিয়ন্ত্রিত মনে হল। আমি বোধহয় তখন সেই কেন্দ্র পার হয়ে এসেছি। সৌভাগ্যবশত আশপাশে কোনো হাঙর ছিল না। যে হিংস্র অতৃপ্ত দমুর দল আমাদের মৃত্যুতরীটাকে চারদিক থেকে ঘিরেছিল আর লাশগুলো দিয়ে রসনা নিবৃত্ত করেছিল, প্রবল পরাক্রান্ত সেই ষড়্‌ এসে ছিন্নভিন্ন করে তাদেরও কোথাও অদৃশ্য করে দিয়েছে।

ঠিক দুপুরের দিকে ‘পেট্রি জেন’ ধ্বংস হল। তার প্রায় দুখণ্টা পর আমি ভাসতে ভাসতে তার পটাভারের একটা কাঠ ধরতে সক্ষম হলাম। মুখলগার বই হচ্ছে তখন। কাঠটাকে দুহাতে চেপে ধরে আছি কোনোমতে। যে কোনো মুহূর্তে ফসকে যাবার সম্ভাবনা। লোজের মতো এক টুকরো দণ্ডি আঁটকানো ছিল কাঠটাকে। বুঝতে পারলাম এভাবে একদিন অস্বস্ত বৈতে থাকতে পারব, অবশ্য এর মধ্যে যদি হাঙর এসে না পড়ে। ঘন্টা তিনেক কিংবা তারও একটু পর, আমি যখন কাঠটাকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছি এবং শেষ পর্যন্ত চলবার শক্তি অর্জনের জন্যে চোখ বুজে প্রাণপণে শুধু বুক ভরে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করছি আর মাঝে মাঝে নিশ্বাস বন্ধও করছি যাতে বেশি করে নিশ্বাস নিতে গিয়ে গভীর জলে ডুবে না মরি, তখন মনে হল আমি যেন কার কষ্টধর শুনতে পেলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাতাস এবং সমুদ্র দুই—ই শান্ত। অবাক হয়ে দেখলাম, আমার থেকে বিশ ফুটেরও কম দূরে আরেকটা কাঠের টুকরোয় ভাসছে ক্যান্টেন ওর্দোজ আর সেই বিধর্মী। কাঠটাকে পুরোপুরি দখল করার জন্যে দুজনই যুদ্ধ করছে, বিশেষ করে ফরাসিটা তো রীতিমতো হাড়াপ উড়তে শুরু করেছে।

‘এই কালো কুত্তা!’ ফরাসি ক্যান্টেন চিৎকার করে উঠেই কানাকার মুখে মারল এক লাথি। ওর্দোজের গায়ে কিছুই ছিল না, শুধু পায়ের একজোড়া ছুতো, তাও ভরী ব্রোজান। বিধর্মীর মুখে সেই ব্রোজানের লাথি খুব জোরেই লেগেছিল। একসঙ্গে মুখে এবং চিবুকে আঘাত পেয়ে সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আমি চাচ্ছিলাম বিধর্মীটা এর প্রতিশোধ

নিক। কিন্তু হতিমধ্যেই সে শান্তভাবে সীতরিয়ে দশ ফুট ব্যবধান চলে গেছে। যখনই সমুদ্রের ঢেউ তাকে কাছে চলে আসে তখনই ফরাসিরা কাটাগে শক্ত করে চেপে ধরে জোড়া পায়ে কানাকাকে লাথি মারতে থাকে। প্রতিবার লাথি মারবার সময় সে মুখ ঝিচিয়ে বলে ওঠে—‘বোটা বিধর্মী, কালো ভৃত !’

‘এই সাদা জানোয়ার, মুহূর্তের মধ্যে ওখানে গিয়ে আমি তোমাকে ডুবিয়ে মারতে পারি শয়তান !’ আমি চৈতন্যে উঠলাম।

ও পর্যন্ত গেলো না, তার একমাত্র কারণ আমি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত। সীতারনারো কথা মনে হতেই মাথা ঘুরে উঠছিল। তাই কানাকাকে নিজের কাছে ডেকে এনে আমারই কাঠের একটা অংশ ওকে ছেড়ে দিলাম। ওর নাম ওটু। আমাকে বলার সময় উচ্চারণ করল: ও-টু-উ। নিজের আরো পরিচয় দিয়ে বলল যে সে সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত বোরোবোরার অধিবাসী। পরে শুনলাম যে সে-ই আগে কাঠটা ধরেছিল। কিছুক্ষণ বস্তুগতির পর সে নিজেই ক্যান্টেন ওদোজেকে একটা অংশ ছেড়ে দেয়। কিন্তু ওদোজে তাকেই লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছে।

এমনিভাবে ওটু আর আমি একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। যে যোদ্ধা ছিল না, যোদ্ধার কোনো পুণ্যই তার মধ্যে আমি দেখতে পাই নি। বড় মিলি, বড় নন্দ স্বভাবের লোক ছিল ওটু। ভালোবাসার একটি সাক্ষর প্রতিমূর্তি যে অর্থচলনায় প্রায় হুচ্চুট। একজন রোমান সৈনিকের মতোই সূঠাম তার দেহ। অবশ্য যোদ্ধা না হলেও সে কাপুরুষ ছিল না কোনো কালেই। সিংহের মতো বলিষ্ঠ তার মন। পরবর্তীকালে সে এমন মারাত্মক মারাত্মক কাজ করেছে যা করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। সে যোদ্ধা ছিল না, সব সময় হাস্যময় এড়িয়ে চলত। কিন্তু আমি দেখেছি বিপদ এলে সে কখনো পিছু হটত না। তখন আমরা ‘ওয়্যার শেল’ জাহাজে। ওটু একদিন তুমুল লড়াই বাধিয়ে বসল। আমি কোনোদিন ভুলব না বিল কিংকে কী মারটাই না সে দিয়েছিল। ঘটনটা ঘটেছিল জার্মানদের সামোয়া দ্বীপে। আমেরিকান নৌবাহিনীতে বিল কিং ছিল শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা। পশ্চিম তান্ত্রিক হিন্দু বিপুলকায় একটা মানুষ। যেন একটা আন্ত গরীলা। সব সময় ছড়োমি, রাত্ত ব্যবহার আর মাঝে মাঝে কায়দামাফিক আভ্যেতে ঘুরি মারা তার স্বভাব। সে-ই প্রথম হাস্যময় শুরু করল। ওটুকে পরপর দুবার লাথি মেরে ফেলে দিল। তার সাথে লড়বার প্রয়োজন বোধ করবার আগে আরেকবার সে ওটুকে আঘাত করল। বোধহয় ওদের লড়াই চার মিনিটও চিকল না। এর মধ্যেই বিল কিং-এর বুকের চারটা পাঁজর ওড়িয়ে গেছে, একটা হাত ভেঙেছে, কাঁধের ওপর একটা হাড় খুলে গেছে। ওটু মুষ্টিযুদ্ধের কোনো বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি জানত না। সে জানত শুধু কী করে লোক শোক্তা করতে হয়। তাতেই এগিয়া সমস্ত কতে বিল কিংকে এমন শায়েস্তা করেছিল যে সুস্থ হয়ে উঠতে তার তিন মাস সময় লেগেছিল।

কিন্তু আমি যেন আমার গল্পের আগে আগে চলছি। আমরা দুজনে কাঠটা ভাগাভাগি করে নিলাম। মাঝে মাঝে আমরা পালা বদল করে একজন চুপ করে শুয়ে থেকে বিশ্রাম নিই আর একজন গলা পর্যন্ত জলে ডুবে থেকে শুধু হাত দিয়ে লেগেতে থাকি কাঠটা। দুইদিন দুই রাত্রি ধরে বহু কষ্টে পালা করে করে কখনো জলে ডুবে, কখনো কাঠে শুয়ে আমরা সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম। শেষের দিকে আমি একরকম ভাল বকতেই শুরু করলাম। মাঝে মাঝে শুনতোম ওটুও তার মাতৃভাষায় রিড্রিফ করে কী সব বকছে। সারাক্ষণ জলে থেকে থেকে শারী শরীর একবারে শিথিল-সিঁক হয়ে পড়েছিল বলে তীব্র পিপাসাতেও আমরা কাহিল হই নি। জিতে সমুদ্রের লোনা জলের স্বাদ আর পিঠে সূর্যের

রোদ মিলে যেন এক বিচিত্র অনুভবের আবারে ডুবে ছিলাম।

অবশেষে ওটুই আমার জীবন রক্ষা করেছে। সমুদ্র থেকে বিশ ফুট দূরে এসে নারকেল গাছের দুটি পাতার ছায়ায় সৈকতের বালুর ওপরেই আমি শুয়ে পড়লাম। ওটু ছাড়া আর কেউ ছিল না আমার পাশে। সে-ই আমাকে ধরে এনে এখানে শুইয়ে দিয়েছে। গাছের পাতা পেড়ে এনে প্রবর রোদ আড়াল করে দিয়েছে। ওটু আমার পাশেই শুয়েছিল। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জাগলাম, আমার চারপাশে এক শীতল রাত্রি বিরাজমান। আকাশে অসংখ্য তারাভরা সুন্দর শীতল রাত্রি। তাকাতেই দেখি ওটু একটা ডাব কেটে আমার ঠোঁটের কাছে ধরে আছে।

‘পেটি জেন’ জাহাজের আমরা দুজনেই কেবল বেঁচেছি। ক্যান্টেন ওদোজে হয়ত এতক্ষণে সমুদ্রের সাথে সংগ্রাম করতে করতে চিরকালের জন্যে শান্ত হয়ে পড়েছে। কদিন পর দেখলাম তীরের কাছ দিয়ে তার কাঠটা একা একা ভেসে যাচ্ছে। আমি আর ওটু এক সপ্তা সেই প্রবালদ্বীপে নেটিভদের সঙ্গে থাকলাম। তারপর এক ফরাসি কুঞ্জার আমাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে তাহিতিতে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যেই আমরা নাম বদলের পর্বটা শেষ করে ফেলেছিলাম। সাউথ সি অফল এমনি নাম বদলের পর্ব দুটি মানুষকে রক্তের সম্বন্ধের চেয়েও বেশি আত্মহুগেলে আপন করে তোলে। উদ্যোগটা আমিই নিয়েছিলাম। আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব শুনে ওটু অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠল।

‘চমকার হল।’ তাহিতির ভাষায় সে বলল, ‘আমরা দুই দিন এক সঙ্গে মৃত্যুর মুখে বন্ধ হয়েছি তা ছিলাম।’ কিন্তু মৃত্যু আমাদের কাছে হেরে গেছে।’ আমি হেসে বললাম।

‘তুমি একটা সাহসিকতার কাজই করেছ বটে, মাস্টার,’ সে উত্তর দিল, ‘তাই মৃত্যু আর কিছু করতে সাহস পেল না।’

‘তুমি আমাকে মাস্টার বলে ডাকলে কেন?’ আমি ব্যথিত হয়েছি এভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমরা তো নাম বদল করেছি। তোমার কাছে আমি ওটু আর আমার কাছে তুমি চালি। তোমার ও আমার মধ্যে চিরকালের জন্যে তুমি হবে চালি আর আমি ওটু হয়ে রইব। এই তো আমাদের জীবনের রীতি। তারপর আমরা যেদিন মরে যাব—মৃত্যুর পর আবার যদি এমন হয় যে আমরা ওই তারা আর আকাশের পারে কোনোখানে জীবন ফিরে পাই, তাহলে সেদিনও তুমি আমার কাছে চালি আর আমি তোমার কাছে ওটু হয়েই থাকব।’

‘ঠিক বলেছ, মাস্টার, তুমি ঠিক বলেছ।’ আনন্দে তার চোখ দুটো চক চক করে উঠল।

‘আবার সেই সম্ভোধান?’ আমি রেগে উঠে বললাম।

‘তাতে কী আছে!’ সে বলে চলল, ‘ওগুলো তো কেবল আমার মুখের কথা, কিন্তু আমি ‘ওটুর’ কথা সর্বদা স্মরণ রাখব। যখনই নিজের কথা ভাবব তখনই তোমার কথা মনে করব। যখনই লোকে আমাকে নাম ধরে ডাকবে, তোমার কথা আমার মনে পড়বে। ওই তারা আর আকাশের পারেও তুমি চিরকাল আমার কাছে ওটু হয়ে থাকবে। এবার হল তো, মাস্টার?’

আমি হাসি গোপন করে বললাম, ‘হয়ছে।’

পাণ্ডিত্যে তোমার মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সে এক ছোট জাহাজে চড়ে নিজের দ্বীপ বোরোবোরাতে চলে গেল। আমি পাণ্ডিত্যের তীরে তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় রইলাম। ছয় সপ্তা কেটে গেল। তারপর একদিন সে ফিরে এল। তাকে পেয়ে ভালো লাগল ঠিকই কিন্তু পরক্ষণেই অবাক হলাম তাকে ফিরে আসতে দেখে। সে আমার কাছে তার

স্বস্তীর কথা বলেছিল। বলেছিল যে সে তার স্বস্তীর কাছেই ফিরে যাচ্ছে। স্বস্তীর সাথেই সে তার অবশিষ্ট জীবনটা কাটাবে, দুঃসমুদ্রযাত্রায় সে আর কোনোনদিন বের হবে না।

'তুমি কোথায় যেতে চাও, মাস্টার?' আমাদের প্রথম আলিসনের পর সে প্রশ্ন করল। আমি কাঁধ ঝাঁকি দিলাম। প্রশ্নটা বড় শক্ত। বললাম, 'গোটা বিশ্বে, সমগ্র পৃথিবীতে, সমস্ত সাগরে, সাগরের সবগুলো ধীপে যাব আমি'।

'আমিও তোমার সঙ্গেই যাব' অবলীলায় বলল সে, 'আমার স্বস্তী মায়া গেছে।' আমার নিজের কোনো ভাই ছিল না। অপরের অনেক ভাই দেখছি, কিন্তু আমার ওঁদের মতো ভাই আর কার থাকতে পারে—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার কাছে সে নিচুর ভাই-ই ছিল না, সে ছিল আমার কাছে বাবার মতো, মার মতো। আমি জানি শুধু ওঁদের জন্যেই আমি একটি সহজ উন্নত জীবন কাটাতে পেরেছি। অন্য কারো পরোয়া করি না, কিন্তু ওঁদের সামনে আমাকে বৃষ্টি সহজভাবে ললতে হত।

শুধু তারই জন্যে আমি বেপরোয়া জীবনযাপন করতে সাহস পাই নি। সে আমাকে তার আদর্শ করে রেখেছিল, তার পবিত্র স্বপ্নের আলোবাসা দিয়ে সে আমাকে মহান করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে অশ্রুপতনের তীরে দাঁড়িয়ে নরকের কপকপে মাঝে ডুবে যেতে বসেছি, কিন্তু ওঁদের ভাবনাই আমাকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে এনেছে। আমাকে নিয়ে তার যে গর্ব সে গর্ব আমার মধ্যে এসে আমাকেও কোন অহংকারী করে তুলত। যা কিছু তার সেই অহংকারকে ক্ষুণ্ণ করে তেমন কিছু না করাটা শেষ পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা অমোঘ নীতিতে পরিণত হল।

কিন্তু স্বভাবতই আমার প্রতি তার সঠিক মনোভাব আমি সরাসরি বুঝে উঠতে পারলাম না। সে আমার কোনো কাজেরই সমালোচনা করত না। আমাকে কোনো কিছুতেই বাধা দিত না। ক্রমে তার চোখে আমি যেন একটা পরিচয় সম্প্রদায় কিছু হয়ে উঠলাম। আমার সকল কাজে শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ না রাখলে তার মনে যে অঘাত লাগে ধীরে ধীরে তা বৃকতে পারলাম।

সতের বছর আমার একসঙ্গে থেকেছি। ওঁটু এই সতের বছর আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আমি যুমোলে সে জেগে জেগে আমাকে পাহারা দিয়েছে। অসুস্থ কিংবা আহত হলে সে আমার সেবা করেছে। আমার জন্যে লড়াই করতে গিয়ে নিজে আহত হয়েছে। এক সঙ্গে আমরা হাওয়াই থেকে সিডনি হেড, টেরেস স্ট্রেইট থেকে গ্যালাপাগোস—গোটা প্রশান্ত মহাসাগরটা ঘুরেছি। নিউ হেল্রিক্স এবং লাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে একেবারে পশ্চিমে যাত্রা করে লুইসিয়ানা, নিউ ব্রিটেন, নিউ আয়ারল্যান্ড, নিউ হ্যান্ডেলার পর্যন্ত ব্যাকবার্ডে যোগ দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। গিলবার্টস, সান্তাক্রুজ এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জে তিন তিনবার আমরা জাহাজ ডুবিয়ে পড়েছি।

আমরা উপার্জন করেছি প্রচুর। যেখানেই আমরা মুক্তা বা বিনুক, নারকেলের শাঁস বা ফলের রস, সামুদ্রিক কচ্ছপ কিংবা চড়ায় অটকানো জাহাজের ভাঙা অংশের কারবারে একটি ডলার মুনাকারও আশা দেখেছি, সেখানেই আমরা নেমেছি। ব্যবসা করেছি। কেনোবাচা করে লাভবান হয়েছি।

পাসিটি থেকেই এর শুরু। যখন সে বলল আমার সাথে সেও সমুদ্রে সমুদ্রে ধীপে ধীপে ঘুরবে তখন থেকেই এই কারবারের আরম্ভ। তখন পাসিটিতে একটি দ্রাব ছিল। সেখানে মুক্তার ব্যাপারী, সাধারণ ব্যবসায়ী, জাহাজের ক্যাপ্টেন, সাউথ সি অঞ্চলের দুর্ধর্ষ লোকগোলা এসে দোদার মদ খেত আর জুয়া খেলত। পড়ীর রাত পর্যন্ত আমিও সেই দ্রাবের

থাকতাম। অবশ্য ভয় হত, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে কিনা। আমি নিরাপদে ঘরে ফিরেছি কিনা দেখতে ওঁটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করত।

প্রথমে ওর দিকে চেয়ে হাসতাম; পরে একটু তিরস্কারই করলাম। তারপর একদিন স্পষ্ট করে বলেই দিলাম যে তার ওসব অবধা সেবাস্থানের আমার প্রয়োজন নেই। এরপর আমি দ্রাব থেকে ফিরে এসে তাকে দেখতাম না। সপ্তাহখানেক পর হঠাৎ করেই তাকে একদিন দেখে ফেললাম। এখনো সে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমগাছগুলোর ফাঁক দিয়ে আমার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। এখন আমি কী করতে পারি? আমি তো জানি, আমি কী করছি।

অবিবেচকের মতো আমি আরো বেশি রাত করতে লাগলাম। কিন্তু বাড়বুটির রাতে, এমনকি হাসিতামাশার হুলাড়ে মধ্যও, সেই আমনের ফাঁক দিয়ে ওঁটু যে আমার ওপর কড়া নজর রাখছে সে যেন জোঁর করে আমার মাথায় এসে ঢুকত। যথার্থই ওঁটু আমাকে ভালো মানুষ করে তুলেছে। কিন্তু সে আমার সঙ্গে সঙ্গ হয়ে উঠতে পারছে না। খ্রিস্টানদের সাধারণ নৈতিকতার কোনো জ্ঞানই তার নেই। বোরাবোরার সবাই খ্রিস্টান। তাদের মধ্যে ওঁটুই শুধু বিধর্মী। ধীপের অধিবাসীদের মধ্যে সে—ই একমাত্র অধিবাসী। ঘোর বস্তাবাদী মানুষ সে। প্রতিশব্দ করে তার মৃত্যুর পরেই শেষ হয়ে যাবে। ন্যায্য ব্যবহার ও সমমর্দাদবোধের বিচার সে চরম অস্বাভাবিক। তার মনে সৎকীর্তি হীনমন্যতা নরহত্যার মতো ঘোরতর অপরাধ। আমার ধারণা অশ্রুপতিত মানুষের চেয়ে একজন হত্যাকারীকেই সে বেশি সমীহ করত।

আমার কাছে বলেছি। জীবনের জন্যে ক্ষতিকারক কোনো কাজ করতে সে আমাকে বার বার নিষেধ করেছিল। জুয়া খেলায় সে অবশ্য কোন দোষ দেখত না কারণ সে নিজেই একজন শাকা জুয়াড়ি।

'কিন্তু রাত জাগা তো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।' সে আমাকে বুঝিয়ে বলত 'আমি দেখছি অনেক লোক নিজের শরীরের যত্ন না নেওয়ার জন্যে ভুগে মরেছে।'

সে নিজেও একেবারে মাদকতাবর্জিত ছিল না। সীয়াতভিয়ে নৌকায় কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে সেও কড়া মাত্রার টিপ টিপ চড়াইত। মদেও তার আপত্তি ছিল না। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে নয়। সে দেখেছে সারা জীবন অপরাধী স্পষ্ট হুইস্কি টেনে টেনেই কতজন মারা গেছে, একেবারে অকর্ণশূন্য হয়ে গেছে কেউ কেউ।

ওঁটু সব সময়েই মনে মনে আমার কল্যাণ কামনা করত। সব সময় আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করত। আমার প্রতি পরিকল্পনাকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করত এবং তাতে আমার চেয়েও বেশি আগ্রহ প্রকাশ করত। আমার কাজে তার এই অসীম আগ্রহের অর্থ আমি প্রথমে বুঝতে পারতাম না, তখন সে গণকের মতো আমার কাজের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা বলে দিত। পাসিটিতে একবার ঘটেছিল এরকম। আমি আমারই দেশের এক প্রবন্ধক ব্যবসায়ীর অংশীদার হয়ে গুয়ানা যাত্রার বন্দোবস্ত করেছিলাম। আগে জানা ছিল না যে লোকটা একটা উদুরের প্রবন্ধক। পাসিটির কোনো শেতাঙ্গও সঠিক জানত না। ওঁটুও প্রথম জানত না, কিন্তু যখন দেখল আমি ধীরে ধীরে সেই গটীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছি তখন সে আমার কিছু বলার অপেক্ষা না করেই তার খবর থেকে আমাকে সরিয়ে এনেছিল। সমুদ্রের দুর্ন কিংবদন্তি থেকে নেটিভ নাবিকের দল তাহিতির বপর এসে হাজির হত, সন্দিগ্ধ ওঁটু তাদের মধ্যে গিয়ে সবরকম খোঁজখবর সংগ্রহ করে নিজের মনের সন্দেহকে নিশ্চিত করে ফেলত। সেই র্যানডলফ সাগরের কাহিনীটা সত্যিই চমকপ্রদ। ওঁটু

যখন গল্পটা আমাকে প্রথম শোনালাম আমার ওড়া বিশ্বাসই ছিল না। তারপর আমি যখন সেই জলপথে বাড়ি আসতে চাইলাম, ওঁট কোনো কথা না বলে শুধু সম্মতি জানাল এবং প্রথম জাহাজে উঠেই অকল্যাৎ যাত্রা করল।

একথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে প্রতি কাজে ওঁটের নাক গলাতো প্রথমে আমার বিরক্তির কারণ ছিল। কিন্তু আমি জানতাম ওঁট স্বার্থান্বেষী লোক। প্রথম না হলেও পরে আমাকে তার জানবুদ্ধির মহত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। আমার ব্যবসার প্রতিটি সুযোগের মুহূর্তে সে তার দৃষ্টি সজাগ রাখত—শুধু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকই নয়, সে ছিল অত্যন্ত দুরদর্শী। আমার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আমার চাইতে বেশি তথ্য জেনে নিয়ে সে আমাকে উপদেশ দিতে চেষ্টা করত, অর্থাৎ যদিও আমার চেয়ে আমার স্বার্থের ব্যাপারে খোলা তার মনে অনেক বেশি থাকত। আমার মধ্যে ছিল বৌদেবের অশান্ত উজ্জ্বলতা। ডলার উপার্জন করার চাইতে রোমান্স করার এবং সারারাত ছুটির পাশে আরাম করার চাইতে অ্যাডভেঞ্চারের দিকেই আমার বৌক ছিল বেশি। এমন অবস্থায় আমাকে একটু দেখাশোনা করবার কেউ থাকায় ভালোই হয়েছিল। আমি জানি সেদিন আমার জীবনে যদি ওঁট না আসত তাহলে আজ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকতাম না।

তার অক্রিয় বন্ধুদের অনেক উদাহরণ আছে। পমোডাসে মুক্তোর কারবার করতে যাবার আগে থেকেই গ্ল্যাক বার্ডি—এর কিছু অভিজ্ঞতা আমার ছিল। আমি আর ওঁট তখন সামোয়ার সৈকতে। সেই সৈকতেরে মাটিতেই তখন আস্তানা গাড়তে হয়েছিল আমাদের। এর পরপরই একটা গ্ল্যাক বার্ডি খ্রিগেডে রিক্রুটার হবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা। ওঁটও আমার সঙ্গে গিয়েছিল। ছয় বছর ধরে বিভিন্ন জাহাজে আমরা মেলানেশিয়ার ঘন জঙ্গলগুলো ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। বীপের মধ্যে চলাফেরা করার সময় ওঁট সব সময় আমার নৌকার দাঁড় তানত। বীপ থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করার নিয়ে অনুযায়ী প্রথমে জাহাজের রিক্রুটারকে তীরে নামিয়ে দেওয়া হত। জাহাজটা তীরের কয়েকশে ফুট দূরে জলের ওপর দাঁড় প্রস্তুত রেখে ভেসে থাকত।

সেই অবস্থায় একদিন হাল খোলা রেখেই কারবারের মালপত্র নিয়ে আমি নৌকা থেকে নেমে পড়তেই, ওঁট তখন দাঁড় তানতের জায়গা ছেড়ে পেছন দিকটার পাটাতনের কাছে গিয়ে বসল। সেখানে ক্যানভাসের আবরণের নিচে একটা উইনচেস্টার রাইফেল হাফের কাছে প্রস্তুত। নৌকার মাল্টিটোগে সশস্ত্র। তার কাছে ক্যানভাসের নিচে বন্ধুর মতোই নিউডার লুকানো ছিল। বীপের সেই কোকডান চুলখলা অসভ্যদের যখন আমি কুইলভান্ডের চাষের কাজে যাবার জন্য তরু করে করে বোঝাছিলাম, ওঁট তখন কড়া পাহারা রেখেছিল এবং মাঝে মাঝে চাপা কণ্ঠে ডেকে ওই অসভ্যদের সন্ধিগ্ধ আচরণ আর নিশ্চুর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল। কখনো কখনো রাইফেলের ক্ষিপ্র আওয়াজ করে সে আমাকে সতর্ক করে দিত—সেটাওঁট পয়লা কুইলভান্ডের। অসভ্যদের আক্রমণের ভয়ে যখন নৌকার দিকে ছুটে যেতাম ওঁট তার দুর্তো হাত সামনে বাড়িয়ে রাখত আমাকে নৌকাতে তুলে নেবার জন্য। আমার মনে আছে, একবার, সন্টিনায় নৌকা থেকে কেবল তীরে নেমেছি আমি অসভ্যরা আমাদের আক্রমণ করল। আমাদের সাহায্য করতে জাহাজটা এগিয়ে আসছিল। কিন্তু ওঁটা এসে পৌঁছাবার আগেই অসভ্যরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলত। ওঁট একলাফে তীরে নেমে আমাদের কারবারের সব মাল বের করে দুহাতে ছড়াতে লাগল—সেই আমাদের পাণ্ডা, চকচকে পাথরের মালা, লোহার বড় বড় কুঠার, সুন্দর বাঁটখালা চাকু, নকশা করা কাপড়—সব।

অসভ্যরা ওগুলো দেখে পাগল হয়ে গেল। লুটপাট শুরু করে দিল। আর সেই সুযোগে আমরা নৌকায় উঠে নির্বিঘ্নে চল্লিশ ফুট দূরে সরে গেলাম। এতে লাভ হয়েছিল বেশ। পরবর্তী চার ঘণ্টার মধ্যে আমি সেখান থেকেই তিরিশ জন শ্রমিক সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

যে ঘটনাটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা ঘটেছিল মালাইতায়। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের পূর্বাঞ্চলে মালাইতার অধিবাসীরাই সবচেয়ে বেশি অসভ্য। কিন্তু নেটিভদের দেখে যে রকম বন্ধুত্ববাপন মনে হল তাতে আমরা কী করে বুঝব যে একটা শ্বেতাঙ্গের মাথা কেনার জন্যে ওরা দুই বছর ধরে চাদা তুলে টাকা জমাচ্ছে? এখানকার সব ভিক্ষুকই মাথা শিকার করে বেড়ায়। বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গের মাথা পেলো তা কথাই নেই; যে মাথটা আনতে পারবে চাঁদার সব টাকা সে-ই পাবে। আমি আগেই বলেছি ওদের দেখলে এমনভাবে তৈশ বন্ধু বলে মনে হতো সেদিন আমি তীরে নৌকা রেখে প্রায় একশো গজ দূরে ওদের বীপের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ওঁট আমাকে প্রথমেই সাবধান করেছিল। তখন তার কথায় কান না দিয়ে পরে অনুতাপ করেছি।

মনে আছে, হঠাৎ একটা জলাভূমির ঝোপের ভিতর থেকে বৃষ্টির মতো বর্ষার ঝাঁক ছুটে এল আমার দিকে। অস্তুত ডজনখানেক আমার গায়ে এসে ঝিল। আমি ছুটতে শুরু করলাম। কিন্তু একটা বর্ষা আমার গোড়ালিতে এসে বিধাতই আমি পড়ে গেলাম। অসভ্যগুলো প্রকাণ্ড সব কুঠার হাতে আমার মাথা কাটার জন্যে ছুটে আসতে লাগল। শ্বেতাঙ্গ মানুষের মাথা কেটে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে ওরা নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। সেই বিস্মতির মধ্যে বাবুর ওপরে একবার এদিক একবার ওদিক পড়ে গিয়ে কোনোমতে কুঠারের কোণ থেকে নিজেই কয়েকবার রক্ষা করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ওঁট এসে উপস্থিত। শায়েস্তা করতে সে জানে। কেমন করে মনে ওঁট একটা ডাঙা যোগাড় করেছিল। শত্রুও এতদূরের কাছ থেকে যুদ্ধ করতে রাইফেলের চেয়েও ডাঙা বেশি কাজে আসে। সে বুদ্ধি করে ওদের দলের ভিতর ঢুক গেল যাতে ওরা বর্ষা গুঁড়তে না পারে। কুঠারগুলোও আর কোথাও কাজে এল না। ওঁট আমার জন্যেই যুদ্ধ করছিল। সত্যিই ওঁট অসভ্যদের ওপর কোনো উম্মত হয়ে উঠেছিল। আচম্ভাবে সে লাঠিটা চালাতে লাগল। বাড়ি লেগে ওদের মাথাগুলো পাকা কমলালেবুর মতো ফেটে যেতে লাগল। তারপর অসভ্যগুলোকে একেবারে তাড়িয়ে দিয়ে আমাকে তার হাতের ওপর তুলে নিয়ে দৌড়তে লাগল। তখনই প্রথম আমার হাত এসে লাগল তার গায়ে। যখন এসে নৌকাতে উঠল তখন দেখলাম ওঁটের গায়ে চারটে বর্ষা লেগেছিল। উইনচেস্টার রাইফেলটা হাতে তুলে নিল সে আর এক একটা গুলিতে এক-একটি করে অসভ্যের প্রাণ শেষ করতে লাগল। তারপর আমরা জাহাজে এসে উঠলাম এবং ডাক্তার ডাকা হল।

সতের বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম। এই দীর্ঘকাল ধরে আসলে সে-ই আমাকে গড়ে তুলেছে। সে না থাকলে একদিনই আমি বেড়োজোর একজন মালবাবু অথবা রিক্রুটার হতাম কিংবা এক টুকরো স্মৃতি হয়ে থাকতাম শুধু।

‘টাকা সব খরচ করে ফেলছ। তারপর আবার বেরিয়েছ; আরো টাকা পাছ।’ সে একদিন বলছিল, ‘টাকা উপায় করা এখন শোভা। কিন্তু তুমি যখন বুজো হবে তখন তোমার সব টাকা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তুমি তখন আর বিড়িয়ে বের হতে পারবে না, আর টাকাও উপার্জন করতে পারবে না। আমি জানি মাষ্টার। তোমাদের শ্বেতাঙ্গদের জীবনযাত্রাপ্রণালী আমার সব জানা আছে। ঐ যে দেখ সৈকতে কত মুড়ে; এককালে

তারাও মুবক ছিল। তোমার মতো তারাও একদিন প্রচুর টাকা কামিয়েছে। কিন্তু আজ তারা বুড়ো হয়ে গেছে, আজ তারা নিরুশ। তোমাদের মতো যুবকের পথ চেয়ে বসে থাকে গুরা—তীরে এলে তোমাদের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে মদ কিনে খাবে।

‘ওই যে কালো ছেলোটো, ওতো একটা ক্রীতদাস। চাষের কাজ করানোর জন্যে ওকে ওরা ধরে এনেছে। কঠোর পরিশ্রম করে। অথচ বছরে মাত্র বিশ ডলার পায়। ওভারসিয়ার শার্টেটা তো কোনো কাজই করে না। ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে শুধু ছেলোটোর কাজ তদারক করে। আর তারই জন্যে সে পায় বছরে বারোশ ডলার। আমি জাহাজের একজন নাবিক। আমি পাই মাসে পনেরো ডলার। তাও পাই কারণ আমি একজন ভালো নাবিক এবং খুব পরিশ্রম করি তাই। ক্যান্টেনের মাথার ওপরে জোড়া চাঁদোয়া। বড় বড় বাতল থেকে সে বিয়ার খায়। কোনোদিন তাকে আমি একটা চোড়া ধরতে বা একটা রশি টানতে দেখি নি। তাও সে পায় মাসে দেড়শো ডলার। আমি একজন সামান্য নাবিক আর সে জাহাজের ক্যান্টেন। মাস্টার, তুমি জাহাজের ক্যান্টেন হতে পারলে খুব ভালো করতে।’

‘ওটু আমাকে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিয়েছিল। প্রথম জাহাজে সে আমার দ্বিতীয় নোট হয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছিল এবং সেই সময় আমি তার ওপরে কোনো আদেশ জারি করলে সে তাতে আমার চেয়েও বেশি গর্বিত হত।

ওটু বলে চলল, ‘ক্যান্টেন বেশি আমি পেলেও জাহাজটা কিন্তু তারই দায়িড়ে থাকে। এক মুহূর্তও সে তার দায়িভের বোকা থেকে অব্যাহতি পায় না। জাহাজের মালিকই যেটা টাকা আর করে। মালিক তার চাকরবাকর নিয়ে তীরে বসে থাকে আর টাকা বাড়িয়ে চলে।’

‘তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু একটা জাহাজ কিনতে অন্তত পাঁচ হাজার ডলারের দরকার। তাও আবার পুরোনো জাহাজই কিনতে হবে ও টাকার।’ আমি বাধা দিয়ে বললাম। ‘পাঁচ হাজার ডলার সঞ্চয় করার আগেই তো আমি বুড়ো হয়ে যাব।’

‘শ্বেতাঙ্গদের টাকা উপার্জন করার তো সহজ পথই আছে।’ তীরের কাছেই নারকেল গাছে থেরা সৈকতের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ওটু।

সে সময়টা আমরা সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। গুয়াডেল ক্যানালের পূর্বতীর ধরে শ্বেত বাদামের পশরা সঞ্চার করছি।

‘নদীর এ মুখ থেকে আরেক মুখের দূরত্ব দুমাইল।’ ওটু বলতে লাগল, ‘ঐ সমতল জমিটা পেননের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখান এর এক আধলাও দাম নেই। কিন্তু কে জানে আগামী বছর কিংবা তার পরের বছর লোকে ঐ জায়গাটুকুই অনেক দামে কিনবে। নোভর ফেলতে খুব সুবিধে এখন। বড় বড় জাহাজ একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়াতে পারে। তুমি মাত্র দশ হাজার আটটা ডামাকের পাতা, দশ বাতল মদ আর আন্দাজ একশো ডলার দামের একটা সুইডার দিয়ে বুড়ো সর্দারের কাছ থেকে চার মাইল বিস্তৃত এই জমিটা কিনে নিতে পার। তারপর কমিশনারকে বলে দলিল ঠিক করে নিয়ে আগামী বছর কিংবা তার পরের বছর চড়া দামে জায়গাটা বিক্রি করে দিয়ে একটা জাহাজের মালিক হয়ে যেতে পার।’

‘আমি তার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলাম। সে যা বলেছিল তাই ঘাঁটল শেষ পর্যন্ত। তবে দুবছর ধরে, তিন বছর লেগেছিল। তারপর এল গুয়াডেল ক্যানালের তৃণভূমি কেনার পালা। সামান্য টাকায় সরকারের কাছ থেকে নশো নিরানব্বই বছরের জন্যে বিশ হাজার একর জমি ইজারা পেলাম। আমি সর্বমোট নব্বই দিন সে ইজারা ভোগ করেছি। তারপর এক কোম্পানির কাছে অর্থেক লাভে বিক্রি করে দিয়েছি। এসব কাজে ওটু ভবিষ্যৎ চিন্তা

করে সুযোগ গ্রহণ করত। তার জন্যেই মাত্র একশ পাউন্ডে ডনকাস্টারের নীলাম ধরে সমস্ত খরচা বাদে তিন হাজার পাউন্ড লাভ পেয়েছিলেন। সাভাইয়ের আবাদ এবং উপলুর কোকোর কারবারের দিকে সে-ই আমাকে চালিত করেছিল।

আমের মতো আমরা আর অত সমুদ্রযাত্রায় বেরতাম না। আমি তো অনেকখানি সংগীতী হয়ে গেছি। বিয়ে করেছি। আমার জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। কিন্তু ওটু? আগের সেই ওটুই রয়ে গেছে। তেমনই মস্তুর গতিতে বাড়ির মধ্যে চলাকরে ছিল। সে পয়সা যায়। মুখে সেই কাঠের পাইপ। গায়ে এক শিলিং-এর একটা শার্ট। চার শিলিং-এর ‘লাভা লাভা’ কোমরের সঙ্গে জড়ানো। আমি তাকে দিয়ে টাকা খরচ করতে পারতাম না। তার কাছে আমার স্বপ্ন একমাত্র অন্তরের অকৃত্রিম দিলেবাসা ছাড়া আর কিছু নিয়ে পরিশোধ করবার উপায় ছিল না। ঈশ্বর জ্ঞানেন, সে ভালোবাসা আমার সকলেই পুরোপুরি দিয়েছিলেন তাকে। আমার ছেলেমেয়েরা তাকে পূজা করত। আর সে যদি সত্যিই দুর্বল চরিত্রের লোক হত তাহলে আমার স্ত্রীও তার কুকর্মের সাক্ষী হতে পারত অনায়াসে।

ছেলেমেয়েগুলোকে তো সে-ই প্রথম বাস্তব পৃথিবীর পথে পা ফেলতে শেখাল। প্রথম হাঁটতে শেখা থেকে শুরু করে সব শিকাই তো তারা পেল ওটুর কাছে। ওদের অসুখ হলে সে পাশে বসে থেকে সেবা করত। এক এক করে ওরা যখন একটু বড় হল তখন ওটু ওদের নিয়ে চলল ঐ লেগুনের পার। ওদের জলে নামতে শিখিয়ে রীতিমতো উভার করে তুলল। মাছের জীবনযাত্রা প্রণালী আর মাছ ধরার কায়দাগুলো সে এমন করে ওদের শেখাল যে আমি কোনোদিনই ওসব জানতাম না। জঙ্গলেও একই ব্যাপার। সাত বছরের টম বনবিদ্যায় এমন পণ্ডিত হয়ে উঠবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। ছবছরের মেরি অকাতর সেই খাড়া পাহাড়টার মাথায় উঠতে শিখল। আমি দেখছিই বলিষ্ঠ লোকেরাও সেই পাহাড়ে উঠতে হাজার বার দম নিত। আর ছোট্ট ফ্রান্সটা যখন ছবছরে পড়ল, আঠার ফুট জলের নিচে থেকে পয়সা কুড়িয়ে আনতে তার কোনোই কষ্ট হত না।

ঝোঝোয়ার আমার স্বজনরা সবাই ব্রিস্টল। তারা আমার মত বিশ্বাসীকে দেখতে পারে না। আমিও বোঝোয়ার ব্রিস্টলদের দেখতে পারি না। একদিন আমার অনেক কথার উত্তরে সে এগুলো বলল। আমি চেয়েছিলাম তাকে দিয়ে কিছু টাকা খরচ করতে। টাকাগুলো তো তাহাই। বলেছিলাম, আমাদেরই একটা জাহাজে করে সে একবার তার নিজের দ্বীপ থেকে ঘুরে আসুক। চেয়েছিলাম, ওর জন্যে একটা বিশেষ সমুদ্রযাত্রা হোক এবং অতিভয়জিতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটা নজির হয়ে থাকুক।

জাহাজগুলো সে সময় আইনত আমার একার নামে থাকলেও আমি ‘আমাদের জাহাজ’ কথাটিই বলতাম। কী প্রচেষ্টাই না করেছি তাকে অশ্বীকার করার জন্যে।

শেষ পর্যন্ত একদিন ওটু বলল, ‘পেটি জেন ডোবার পর থেকেই তো আমরা অশ্বীকার হয়ে গেছি। এর পরেও যদি তোমার মন চায় তাহলে ঠিক আছে, আইনসঙ্গতভাবেই আমি তোমার অশ্বীকার হব। দেখ, আমার কোনো কাজ নেই অথচ কত খরচ। মদ, পাইপ, খাওয়াদাওয়া এগুলোতে অনেক টাকা খরচ হয়। মাছ ধরা তো বড় লোকদের রীতিমতো শরৎ ব্যাপার। বড়শি আর সুতার কী দাম। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমাদের আইনসঙ্গত ভাবেই অশ্বীকার হতে হবে। আমার যখন টাকা লাগবে, অফিসের হেড ক্লার্কের কাছ থেকে তা নেব।’

কাগজপত্র সব পাকাপাকি হয়ে গেল। কিন্তু এক বছর পরেই আমি অভিযোগ করতে বাধ্য হলাম। ‘চার্লি, তুমি একটা পাঞ্জি ভণ্ড। এক নম্বরের কৃশণ।’ আমি বললাম ‘দেখ,

আমার অশ্লীলার হিসাবে এবছর তোমার লভ্যাংশ হয়েছে কয়েক হাজার ডলার। এই দেখ হেডক্লার আমার কাছে হিসেব পাঠিয়েছে। এতে দেখা আছে যে তুমি সারা বছরে কোম্পানীর কাছ থেকে মাত্র সাতাশি ডলার বিশ সেন্ট নিয়েছ।'

'আরো পাব নাকি?' সে যেন উত্থিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল।

'আরে বললাম তো, হাজার ডলার।'

আমার কথা শুনে যেন মুক্তির আশ্বাসে মুখটা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তাহলে ভালোই হল। দেখছ তো, হেডক্লার আমাদের কী কড়া হিসাবে রাখছে। যখন আমার লগবে তখন টাকা চাইবই। একটি সেন্ট হারালেও চলবে না। আর যদি হারায়, হেডক্লারের মাইনে থেকে আদায় করব।' মাঝখানে একটু দম নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই শেষের কথাটুকু সে বলল।

পরে জানতে পারলাম ওঁ দু'আমার নামে তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করে আমেরিকান কনসালার দায়িত্বে নিরাপদে রেখে দিয়েছে। কাথুরাসদের দিয়ে সে নিজে উইল লিখিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু এবার সমাপ্তি ঘনিয়ে এল। সমস্ত মানবসম্পর্কের ক্ষেত্রেই একদিন সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে। সেই সেলামন দ্বীপপুঞ্জ, যৌবনের দুর্বল দিনগুলোতে যেখানে বেপরোয়া সব কাব্যকর্ম করছি, সেখানে আর একবার আমার অবসর করে কাটতে। অবশ্য সুযোগ করে নিয়ে ফ্লোরিডা দ্বীপ আমাদের জমিটা আর বলাগিরিবর্তে মুক্তো পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা তা দেখবার ইচ্ছাও ছিল। কিউরিভো সংগ্রহের আশায় আমরা সাহুতে অবস্থান করছিলাম।

সাহু হাঙরের লীলাক্ষেত্র। সংলগ্ন জলরাশির বিস্তারে তারা কেলি করে বেড়ায়। মৃতদেহের সংকার করতে চিরায়িত প্রথা অনুযায়ী অসভ্যরা সেগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এত বড় প্রলোভনও ওদের লীলাক্ষেত্র ছেড়ে আসতে উৎসাহিত করে না। আমার গ্যাংই বলতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত বোঝাই ছোট একটা নৌা ডিঙ্গার কপে আসছিলাম। ডিঙিটা উল্টে গেল। আমি ছাড়াও তাকে বারজন কোঁকড়া চুলঅলা নেটিভ ছিল। আমরা ডিঙিটা ধরে বুলছিলাম। জাহাজটা তখনো একশ গজ দূরে। একটা নৌকা পাঠানোর জন্যে ডাকডাকি শুরু করলাম আর তখনই একটা নেটিভ আত্ননাদ করে উঠল। ডিঙার যে প্রাঙটি সে আঁকড়ে ধরেছে সে দিকটা সমতল কী যেন তাকে বার বার নিচের দিকে টানছে তার হাতটা অবশ হয়ে গেল। সে জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা হাঙর তাকে নিয়ে গেছে।

বাঁকি তিনজন নেটিভ জলের মধ্যে থেকে ডিঙার তলার ওপরে উঠে আসতে চাইল। আমি ঠেচিয়ে নিষেধ করলাম, গুলি দিলাম, সবচেয়ে কাছে যে ছিল তাকে একটা মুষ্টিও বসিয়ে দিলাম। কিন্তু তাই কি শোনে। তখন ওরা আতঙ্কে অন্ধ হয়ে গেছে। ডিঙিটা কোনো মতে ওদের একজনের ডার সইতে পারল। কিন্তু তিনজনের ভারে কাত হয়ে দূরে গেল আর ওরা জলেই ছিটকে ভাসল।

আমি ডিঙিটা ছেড়ে দিয়ে জাহাজের দিকে সাতরাতে লাগলাম। ভাবলাম ইতিমধ্যেই নৌকাটা এসে আমাদের উদ্ধার করে নেবে। নেটিভদের একজন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। আমরা বার বার জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে হাঙর দেখতে দেখতে, নীরবে, পাশাপাশি সাতরাতে লাগলাম। ডিঙার পাশে যে লোকটা ছিল তার আত্ননাদ শুনে বুঝলাম তাকেও হাঙর পেয়েছে। জলের মধ্যে তাকিয়েছিলাম; দেখলাম একটা বিরাট

হাঙর আমার নিচ দিয়ে চলে গেল। সম্পূর্ণটিই দেখলাম। পুরোপুরি ষোল ফুট লম্বা হবে হাঙরটা। আমার পাশের নেটিভটার পেট আর কোমর কামড়ে ধরল সেটা। তারপর তাকে দূরে নিয়ে চলল। যেতে যেতে হতভাগা বেচারী হাত, মাথা, কাঁধ, জলের ওপরে উঁচুতে উঁচুতে হৃদয়বিদারী চীৎকার করতে লাগল। কয়েকশ ফুট তাকে এভাবে নিয়ে গিয়ে জলের নিচে টেনে নিল হাঙরটা।

এটাকেই শেষ মুহূর্তই হাঙর মনে করে আমি প্রাণপণ সাতরাতে লাগলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আরেকটা এল। জমি না, এটাই সেই হাঙর কিনা যেটা কিছুক্ষণ আগে ঐ নেটিভদের আক্রমণ করছিল, নাকি অন্য কোনোনাথ থেকে ভ্রমণ করে আসা হাঙরটা হাঙর। যেটাই হোক, অনাগুলের মতো অত ক্ষিপ্ত নয় এটা। আমি আগের মতো জোরে সাতার কাটতে পারছি না। উদ্যমের অধিকাংশ দিয়ে হাঙরটার গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। সে যখন আমাকে প্রথম আক্রমণ করল আমি তখন তার ওপর নজর রেখে চলেছিলাম। ভাগ্যক্রমে দু'হাতে তার নাক চেপে ধরলাম। তাই তার ভরে তলিয়ে যেতে যেতেও তাকে তফাৎ রাখতে সক্ষম হলাম। পরিষ্কার দেখলাম ও দু'হাতে এক এবং চারপাশে ঘুরতে লাগল। দ্বিতীয়বার একই কৌশলে তাকে এড়িয়ে গেলাম। তৃতীয়বারের আক্রমণটা উভয়ের কারণেই ফসকে গেল। আমার হাত তার নাকের ওপর পড়তেই সে সরে গিয়েছিল। কিন্তু তখন শিরির কাপড়ের মতো তার খরবার চামড়ার ঘর্ষণে কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত আমার হাতের চামড়া (আমার গায়ে তখন হাতাছাড়া একটা গেঞ্জি মাত্র) একবারে উঠে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে আমি সম্পূর্ণ কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। সব আশা ছেড়ে দিলাম। জাহাজটা তখন দুশো ফুট দূরে। আমি জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে লক্ষ্য করছিলাম হাঙরটা আরেকটা আক্রমণের কৌশল আঁচিছে। এমন সময় একটা পিঙ্গল বর্ণ শরীর আমাদের মাঝখানে ভেসে এল। সে আর কেউ নয়, গুঁট।

'জাহাজের দিকে সাতরে যাও, মাস্টার।' সে এমনভাবে বলল যেন ব্যাপারটা একটা তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়, 'হাঙরের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, ওরা আমার ভাই।'

তার কথামতো আস্তে আস্তে সাতরে চললাম। নিজেকে আমার আর হাঙরের মাঝখানে রেখে গুঁট সাতরাতে লাগল। এবং বার বার হাঙরটার আক্রমণ বিফল করে দিয়ে আমাকে উৎসাহ দিয়ে চলল।

মিনিট বানেক পরেই গুঁট আমাকে বুঝিয়ে বলল, 'ডিঙি নামানোর মাচনটা সরিয়ে নিয়ে জাহাজ থেকে ওরা দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে আরেকটা আক্রমণ প্রতিহত করতে ডুব দিল।

প্রায় এসে গেছি। জাহাজটা আর মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে। কিন্তু আমি যেন আর নড়তে পারছিলাম না। ওরা জাহাজ থেকে আমাদের দিকে রশি নিক্ষেপ করছে কিন্তু প্রতিবারই তা আমার নাগালের বাইরে যাচ্ছে। ওদিকে হাঙরটা তেমন কোনো আঘাত না পেয়ে আরো দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছে। বদ্বার সে আমাকে ধরবার উপক্রম করল কিন্তু প্রতিবারই বিপর্যয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে গুঁট এসে আমাকে বাঁচাল। আত্মরক্ষার সকল সুযোগ উপেক্ষা করে গুঁট আমাকেই আগলে রাখল।

'বিদায় চালি, আর পারলাম না।' অতিকষ্টে উদ্ধারণ করলাম।

বুঝতে পারলাম আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এফুনি হয়ত হাত-পা ছেড়ে তলিয়ে যাব।

কিন্তু ওটু আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, “তোমাকে একটা নতুন খেলা দেখার, হাঙরটাকে আমি বিতৃষ্ণ করে দিচ্ছি।”

সে আমার পেছন দিকে সরে গেল। হাঙরটা সেখান থেকেই আমাকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

‘আরেকটু বাদিকে যাও। জলের ওপরে একটা রশি ভাসছে বাঁয়ে, মাস্টার, আরেকটু বাঁয়ে।’ পরক্ষণেই সে আবার বলে উঠল।

আমি দিক পরিবর্তিত করে অঙ্কের মতো হাতভাবে লাগলাম। আমার সমস্ত চেতনা তখন লুপ্তপ্রায়। দড়িটা আমার হাতে ঠেকতেই জাহাজ থেকে ওনের উল্লাস কানে এল। আমি পেছন ফিরে তাকলাম। ওটুকে পেলাম না। পরক্ষণেই সে ভেসে উঠল। দুটো হাতই কজ্জি থেকে কাটা। কাটা থেকে ফিনিকি দিয়ে রক্ত বরছে।

‘ওটু!’ সে কোমল আন্তরিক সুরে ডাকল।

তার কপিত কণ্ঠস্বর যে আন্তরিক ভালোবাসা ধ্বনিত হল, তার দৃষ্টিতেও দেখলাম তারই প্রতিফলন। এখন, কেবল এখনই, আমাদের দীর্ঘ সঙ্গীতীব্যবসার এই অন্তিম মুহূর্তে সে আমাকে এ নামে ডাকল।

তার কণ্ঠে শেষবার উচ্চারিত হল, “বিদায়, ওটু!”

সঙ্গে সঙ্গে একটা হ্যাঁচকা টানে সে নিচে তলিয়ে গেল। আমাকে টেনে তুলল ওরা জাহাজের ওপরে। ক্যাপ্টেনের হাতের ওপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

এমনিভাবে বিদায় নিল ওটু। সে আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলেছিল; শেষ মুহূর্তে সে-ই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে গেল। কড়ের গর্ভে যাকে পেয়েছিলাম, হাঙরের গর্ভে তাকে হারালাম। নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্বের সত্যেরটি বছর আমার একত্রে অতিবাহিত করেছে। একজন শ্বেতাঙ্গ আর একজন পিসল বর্ণ মানুষের মধ্যে এমন নিবিড় বন্ধুত্ব হয়ত পৃথিবীর আর কোনো দুটি মানুষের জীবনেই সম্ভব হয় নি। ঈশ্বর যদিও তাঁর উচ্চাসন থেকে জীবজগতের সামান্য কুট্যাটির পতনও লক্ষ্য করে থাকেন তবু তাঁর রাজ্যে বোরাবোরা দ্বীপের এই বিধবী ওটু বুঝি বিদায় নিল সকল লক্ষ্যের অগোচরে।

আগুন জ্বালতে হলে

দুর্ভয় একটি শীতের সকাল। দিনের আলো ফুটেছে কিন্তু চারদার এখনো মোলাটে। লোকটি এতক্ষণ ইউকন নদীর তীর বরাবর পায়ে হাঁটা পথটা ধরে এগোচ্ছিল। এবার নদীর তীর ছেড়ে বাঁড়া চড়াই বেয়ে উঠে আসে পাড়ের ওপর। দেবদারু বনের মাঝ দিয়ে পূর্ব দিকে চলে গেছে সুরু একটা পায়ে হাঁটা পথ। পথটিতে মানুষেরো পায়েয় ঝিক খুব কমই পড়েছে বোধহয়। চড়াই ভেঙে সমতলে উঠে হাঁপিয়ে পড়ে লোকটি। দম নিতে একটু দাঁড়ায়, নিজের দুর্বলতাকে সে নিজের কাছেও ব্যস্ত করতে নারাজ। এমনভাবে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফেরায় যেন কটা বেজেছে দেখার জন্যেই থামা। বেলা কম হয় নি, নীটা বাজে। আকাশের বৃকে একটুও মেঘ জমে নি, তবু সূর্যের দেখা নেই, কোনো লক্ষণই নেই দেখা দেবার। মেঘমুক্ত দিনটির ওপর যেন বিষমুতা তার ওড়না বিছিয়ে রেখেছে। প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে একটা মলিন ধূসরতা। সূর্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে নি বলেই এরকম লাগছে। অবশ্য লোকটি তার জন্যে কিছুমাত্রও চিন্তিত নয়। কেননা সূর্যহারা দিনের সঙ্গে ওর দীর্ঘদিনের পরিচয়। পরপর বেশ কয়েক দিন সূর্য ওঠে নি এবং আরো কয়েক দিন উঠবেও না, তারপর হঠাৎ একদিন দক্ষিণ আকাশে একটি রক্তিম পিণ্ড মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই আবার দিগন্তপারে মূখ লুকাবে।

লোকটি পিছনে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল। মাইলখানেক চওড়া ইউকন নদীর ওপর তিন ফুট বরফের কঠিন আস্তরণ। তার ওপর আবার তিন ফুট উচু তুষারপুঞ্জ অমলিন শুভ্রতার সুকোর ওপর ছোট ছোট টেপে-এর মতো বিছিয়ে আছে। উত্তর কি দক্ষিণ যে দিকে তাকানো যাক শুধু অবিচ্ছিন্ন তুষারের আবরণ আর তার মধ্যে চুলের মতো একটি রেখা একে বেকে এগিয়ে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। এইটিই প্রধান সড়ক। আর এই সড়কের ওপরেই লোকটি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুষার সমুদ্রের মধ্যে যেন দ্বীপের মতো নিঃসঙ্গ এই দেবদারু বনভূমি। সুদূর উত্তরে অবশ্য আরেকটি দেবদারু গাছের দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। পথেরবাঁটি লুপ্ত হয়েছে ওখানেই। পথটির দক্ষিণমুখী দৈর্ঘ্য পাঁচশ মাইল। ঢিলকুট পাল, ডাইয়া হয়ে সমুদ্রে গিয়ে শেষ হয়েছে। উত্তরে এগোলে হাজার মাইল পার করে পথটি এসে পড়েছে নুলাটোয়। নুলাটো ছেড়ে আরো হাজার মাইল পেরিয়ে পথটি বেরিঙ সাগরের কুলে সেন্ট মাইকেলে এসে শেষ হয়েছে।

চুলের মতো সুরু এক ফালি এই রহস্যময় পথ, সূর্যহীন আকাশ, তীব্র শীত বা বিচিত্র কৃতকগুলো পরিস্থিতির সমাবেশ—কোনোটিই লোকটির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। লোকটি যে দীর্ঘকাল এ জীবনে অভ্যস্ত তাও নয়। বলতে গেলে সে সম্প্রতিই এসেছে। এ অঞ্চলের শীতকালের সঙ্গে এই-ই তার প্রথম পরিচয়। মুশকিল বেধেছে লোকটির চিন্তাশক্তি অত্যন্ত কম বলেই। জীবনে যাই ঘটুক না কেন সে অত্যন্ত স্রুততার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ ফলাফল কী হবে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পারে না। মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি মানেই হিমাক্ষের নিচে আশি ডিগ্রি পরিমাপ তুষার। এই অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপারটার গুরুত্ব বলতে সে বোঝে শুধু ঠাণ্ডায় বানিকটো অস্বস্তি বোধ করা। আর কিছুই না। সে একবারও ভাবে না যে মানুষ চিরঞ্জয়ী নয়, শীত ও

গ্রীষ্মের একটা নির্ধারিত মাত্রার মধ্যেই তার পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব। সে কোনোদিনই মানুষের নশ্বর দেহের কথা ভাববে না, মহাবিশ্বে মানুষের স্থান কোথায় তাই নিয়ে চিন্তিতও হয়ে পড়বে না। তাপমাত্রা শূন্য ছাড়িয়ে পক্ষাশ ভিগ্নি নিচে নামা মানে তার কাছে হাড় কাপানো শীতে কষ্ট পাওয়া আর তাই তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন পশমি দস্তানা, কানঢাকা টুপি, গরম জুতো আর মোটা মোজা পরা। মাইনাস পক্ষাশ ভিগ্নি মানে তার কাছে মাইনাস পক্ষাশ ভিগ্নি। এ ছাড়াও যে এর আর কোনো অর্থ থাকতে পারে সেটা তার মগজে কোনোদিনই ঢুকবে না।

যাত্রা শুরু করার আগে কী ভেবে লোকটা হঠাৎ থুতু ফেলে। অমনি পটকা ফাটার মতো একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হয়। লোকটি আবার থুতু ছেঁটায়। আবার পটকা ফাটার শব্দ। লোকটি অবাক হয়ে ভাবে হিমাক্ষের পক্ষাশ ভিগ্নি নিচে ভূযারের সম্পর্শে এলে থুতু এরকম শব্দ করে ফাটে কিন্তু এখন তো ভূয়ার সম্পর্শ করারও প্রয়োজন হচ্ছে না! বাতাসেই বিশ্লেষণ ঘটেছে। তার মানে পায়ের নিচে তাপমাত্রা পক্ষাশ ভিগ্নির ও কম। অবশ্য কতটা কম তা জানার উপায় নেই, আর তা নিয়ে ওর চিন্তাও নেই। এখন ওর হেভারসন ঝাঁড়ির বা ফালিতে অবস্থিত খনি অঞ্চলটিয়া শৌছানো দরকার। দলের বাকি লোকেরা ইতিমধ্যেই সেখানে একটু ঘুরপথে। ইউকন বীপ থেকে বসন্তকালে গায়ের গুড়ি সরবরাহ করা যাবে কিনা খোঁজ নেবার জন্যই এই পথে ওর আগমন। ছটার মধ্যেই শিবিরে পৌঁছে যাবে নিশ্চয়। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে আসবে ঠিকই কিন্তু শিবিরে পৌঁছে গেলে আর দৃষ্টিস্তার কোনো কারণ নেই। ততক্ষণে ওরা আগুন ছেলে ছেলে ফেলবে। রাতের খাবারও তৈরি থাকবে। আর দুপুরের খাওয়া—কথটা মনে পড়তেই ও পেটফোলা জ্যাকেটের ওপর হাত ঠেকায়। জ্যাকেট আর শার্টের তলায় একেবারে গায়ের চামড়া স্পর্শ করে আছে একটা গুঁটিল। রুমাল দিয়ে জড়ানো বিস্কটগুলাে যাতে জমে না যায় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। বিস্কটগুরের কথা মনে পড়তেই লোকটির মুখে দীর্ঘ হাসির আভাস দেখা দেয়। শুয়োরের চর্বি মাখানো বিস্কটগুলাে টুকরো করে কটা আছে আর টুকরোগুলোর মাঝে আছে শুয়োরের ফাঁকের সুক পুস্ক ফালি।

লোকটা এবার দেবদারু গায়ের ফাঁক দিয়ে এগোতে শুরু করে। শেষ স্নেজ গাড়িটা পেরিয়ে যাবার পর কম করে অন্তত এক ফুট ভূয়ারপাত হয়েছে। লোকটি ভাবে ভাব্য তার ভালো যে সঙ্গে স্নেজ গাড়ি নেই। মালপত্র থাকলে এখন দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। সতিহ বলতে কি তার কাছে এই খাবারের গুঁটিলটা ছাড়া আর কিছুই নেই। ও কিন্তু শীতের প্রকোপ দেখে বিশ্রান্ত হয়। অবশ্য নাক আর গালের ওপর দস্তানা পরা হাতটা বোলায়। সতিহই দারুণ ঠাণ্ডা পড়ছে আজকে। মুখভর্তি দাড়ি থাকা সত্ত্বেও গালদুটো একেবারে হিম হয়ে গেছে। নাকের ডগাটারও অবস্থা একই। যা উচু নাকটা, শীতল বাতাসের মধ্যে একেবারে যেন গুঁজে রয়েছে।

লোকটির পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে একটা ধূসর বর্ণ লোমঙলা কুকুর। বুনা নেকড়ের একেবারে সক্ষাৎ জাত ভাই। যেমন মোজাজ তেমনি তার চেহারা। কুকুরটাও ঠাণ্ডার চোটে কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। ও জানে এটা পথ চলার উপযুক্ত সময় নয়। ইন্ট্রি-নির্ভর তপুবারটির বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে। বিচারক্ষম মানুষটির চেয়ে অনেক বেশি নির্ভুল। আপলে কুকুরটা এখন হিমাক্ষের নিচে পক্ষাশ ভিগ্নি নয়, যাট ভিগ্নি নয়, এমন কি সত্তর ভিগ্নিও নয়। হিমাক্ষের নিচে পঁচাত্তর ভিগ্নি। শূন্যের ওপর বত্রিশ ভিগ্নিতে হচ্ছে হিমাক্ষ, তাই এখন

যা তাপমাত্রা তাতে একশ ভিগ্নি সমান ভূয়ারপাত হয়েছে। কুকুরটা খারোমিটার সম্বন্ধে অজ্ঞ। মানুষের মতো, 'খুব ঠাণ্ডা' বলে একটা অবস্থাকে শনাক্ত করার মতো ক্ষমতা সম্ভবত কুকুরের মস্তিষ্কের নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সহজাত প্রবৃত্তি বলে একটা জিনিস আছে। কুকুরটাও তাই একটা অস্পষ্ট অর্থাৎ ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার আশঙ্কায় কেমন জ্বুথুথু হয়ে পড়েছে। লোকটির একেবারে পায়ে পায়ে জড়িয়ে রয়েছে। যেন প্রতি পদক্ষেপেই সে মানুষটিকে প্রশ্ন করছে, কী প্রয়োজন এলিক যাবার? চলা, সোজা ক্যাম্পে ফিরে যাই! মনুষ্যটিকে প্রশ্ন করছে, কী প্রয়োজন সন্ধান কর। একটা আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসা যাক!

কুকুরটার নিশ্বাসের সঙ্গে নির্গত জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে কণা কণা ভূয়ার হয়ে তার গায়ের লোমের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে ঠোঁট, নাক আর চোখের পাতা একেবারে সাদা হয়ে উঠেছে। তবে কুকুরটির চেয়েও আরো বেশি পরিমাণে এবং আরো ঘন হয়ে ভূয়ার জমেছে লোকটির লাল দাড়ি আর গালের ওপর। এক এক বার উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে, সেই সঙ্গে জমাট বরফের পরিমাণও আরো বাড়ছে। লোকটি খৈনি চেবাচ্ছে কিন্তু ঠোঁটের চারপাশে বরফ থাকার দরুন ভালোভাবে হাঁ করে পিক ফেলতে পারছে না। ফলে পিকটা চিবুক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে আর সঙ্গে সঙ্গেই জমাট বেঁধে ঝয়ের রঙের একটা স্পষ্টকির দাড়ির উত্তরোত্তর দীর্ঘতায় পড়েছে। হঠাৎ ও যদি পড়ে যায় ভদ্রুর কাঁঠের মতো ওই দাড়িটিও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়বে। তবে এই অভিব্যঙ্গ-সংযোজন নিয়ে লোকটি মোটেই চিন্তিত নয়। এ অঞ্চলে যাদের খৈনির নেশা আছে তাদের প্রত্যেককেই এই খেসারতটি দিতে হয়।

বেশ কয়েক মাইল সমতল বনভূমি পেরিয়ে, একটি ছোট্ট নদীর পাড় ভিগ্নিয়ে লোকটি ভূয়ারপূর্ণ নদীর বুকে পা রাখে। এটাই হেভারসন ঝাঁড়ি। আর দশ মাইল এগোলেই এই ঝাঁড়ির বিধাবিকৃত মুখটির কাছে পৌঁছানো যাবে। এখন দশটা বাজে। ফণ্ডায় ও চার মাইল করে এগোচ্ছে। কাজেই ঝাঁড়ির মুখটার কাছে পৌঁছতে বেলা সাড়ে বারোটা হবে। লোকটি ভাবে দুপুরের ভোজন থালা ও ওখানে পৌঁছেই সাবায়।

বরফ জমা নদীর ওপর নামতেই কুকুরটাও তাকে অনুসরণ করল। লেজটা প্রায় পেরের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছে। বেশ বোকা যাচ্ছে কুকুরটা হতাশ হয়েছে। স্নেজ চলার দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ছে এখনো। কিন্তু স্নেজের সহযাত্রীদের পসিহি লুপ্ত হয়ে গেছে প্রায় ফুট থাকলেও ভূয়ারের তলায়। গত এক মাসের মধ্যে এ অঞ্চলে কারো পায়ের ছাপ পড়ে নি। নীরবে লোকটি এগিয়ে চলে। চিন্তা ব্যাপারটা ওর আদৌ আসে না। এই মুহুর্তে ওর মাথায় আছে শুধু দুপুরের ভোজন সাদা করার আর তারপর ক্যাম্পে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চিন্তা। সঙ্গে একজনও লোক নেই যে কথা বলবে। তবে কণা বলায় লোক থাকলেও সে কথা বলতে পারত না। ঠোঁটের দুধারে জমে আছে বরফ। লোকটি শুধু একটানা খৈনি চিরিয়ে যাচ্ছে আর তার স্পষ্টকির দাড়ি ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

এর মধ্যে এক আধারের ওর মনে হইতেছে যে ঠাণ্ডাটির স্তিহি আজ খুব বেশি পড়েছে। এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। হাঁটতে হাঁটতেই বার বার সে দস্তানা পরা হাতের তালু দিয়ে একবার গাল ঘষে আর একবার নাক। প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো আপনা থেকেই একবার বা হাত আর একবার ডান হাত ব্যবহার করে। কিন্তু যতই যত্নে কৃত হাত সরালেই দেখে নাক আর গাল সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডায় গায়ের অবশ হয়ে যাচ্ছে। গালে ভূয়ারক্ষত হবার নিশ্চিত সন্ধানো লোকটি বুঝতে পারে। মনে মনে অনুশোচনা হয় বাউরের কথা মতো নাক ঢাকার একটা ব্যবস্থা করে নি বলে। ফিতে লাগানো নাক ঢাকার ব্যবস্থটা থাকলে গাল দুটোতেও

আর তুষার-কৃত হত না। কিন্তু এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার তেমন কোনো কারণ নেই। গালে তুষার-কৃত হলেই বা কী? বড়জোর একটু যন্ত্রণা পেতে হবে। তেমন বিপজ্জনক কিছু ঘটার আশঙ্কা নেই।

লোকটির মাথায় কোনো চিন্তা না থাকলেও তার দৃষ্টি কিন্তু অত্যন্ত সজাগ। বাড়ির আঁকাবাঁকা গতিপথ আর আটকে থাকা গাছের গুঁড়ির দিকে সতর্ক চোখ রেখে তবেই সে পদক্ষেপ করছে। একটা বাক পেরিয়ে প্রথম পা ফেলেই সে হঠাৎ যেন বিস্ময়ে চৌচিয়ে ওঠে। নিমেষের মধ্যে পা সরিয়ে নেয় এক পাশে। তারপর পিছিয়ে আসে কয়েক পা। ও জানে বাড়ির জল তলা অবধি সম্পূর্ণ জমে আছে। শীতকালে কোনো বাড়িতেই জল থাকা সম্ভব না হলেও এসব অঞ্চলে এমন অকালে পাহাড়ি বরাণে যাওয়ার জল ওই বরফ জমা বাড়ির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় কিন্তু বরাণে তুষারের আড়ালে থাকে বলে ওপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। যতই ঠাণ্ডা পৃথক এইসব বরাণের জল কিন্তু জমে না। এগুলো এক একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ফাঁদ। কখনো কখনো আধ ইঞ্চি পুরু বরফের তলায়ও আত্মগোপন করে থাকে জলের কুণ্ড। বরফের ওপর আবার পড়ে থাকে তুষারের আশ্রয়ণ। কখনো কখনো পরপর বেশ কয়েক স্তর জল আর বরফ এইভাবে লুকিয়ে থাকে। একবার যদি সেখানে পা পড়ে, একের পর এক বরফের পর্দা ভেঙে এক কোমর জলের মধ্যেও তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

ভীত হয়ে পিছিয়ে আসার কারণ এইটাই। স্পষ্ট টের পেয়েছে পায়ের চাপে মড়ক করে উঠেছে এমন একটা পাতলা বরফের পর্দা। তুষারের ঢাকা আছে তাই কিছুই বুঝতে পারে নি। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পা ভিজে যাওয়া মানেই হান্সমা আর বিপদ। আর কিছু যদি নাও হয় যাত্রায় বিলম্ব তো হবেই। প্রথমেই একটা আগুন জ্বালতে হবে, তারপর সেই আগুনের সামনে পা রেখে জুতো মোজা খুলে সেগুলো শুকিয়ে নিতে হবে। এক জায়গায় দাঁড়িয়েই বাড়ির পৃষ্ঠদেশে আর পাড়গুলো খুব ভালো করে পরীক্ষণ করে লোকটি। শেষ পর্যন্ত হির করে যে জলস্রোতটি এসেছে তার ডান দিক থেকে। নাক আর গাল ঘষতে ঘষতে বানিক্ষণ চিন্তা করে অবশেষে বেজার মুখে সে বাদিক ধৈর্যে চলতে শুরু করে। প্রতিটি পদক্ষেপের আগে আলতো করে একবার পা ছুঁয়ে দেখে নিচ্ছে। বিপদসীমা অতিক্রম করে লোকটি আবার মুখ খেঁচি পোরে। এতক্ষণে সে আবার আগের মতো খট্টা পিছু চার মাইল বেগে হাঁটতে শুরু করে।

পরবর্তী দুখন্টার মধ্যে লোকটি বেশ কয়েকবার এরকম ফাঁদের সম্মুখীন হয়েছে। এর মধ্যে একবার অবশ্য ও অশ্পের জন্য বেঁচে গেছে। হঠাৎ সন্দেহ হওয়ায় একটা জায়গায় ও কুকুরটাকে আগে ছেলে দিয়েছিল। কুকুরটা প্রথমটার যেতে চায় নি। শেষ পর্যন্ত তড়া করে নিরপায় হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। সাদা বরফের ওপর ক'পা না এগোতেই হঠাৎ বরফ ভেঙে প্রায় মুখ ধুবড়ে পড়েছিল কুকুরটা। কোনোরকমে সামলে নিয়ে সর এসেছে। ততক্ষণে কিন্তু তার সামনের পা দুটো হিমশীতল জলে ভিজে গেছে। জল থেকে পা বের করা মাত্র পায়ে থেঁটুকু জল লেগেছিল তা বরফ হয়ে জমে যায়। বরফ-মুক্ত হবার জন্যে কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে পা চাটতে শুরু করে। তারপর তুষারের ওপর বসে না দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে পায়ের আঙুলের ফাঁকে জমা বরফ কাটতে শুরু করে। এটা একটা প্রবৃত্তিগত ব্যাপার। বরফটা থাকলে যে পায়ে কত সৃষ্টি হবে এ কথা কুকুরটা জানে না, তবু তার প্রাণিস্বাধার গভীরে জাত এক রহস্যময় নির্দেশকে সে মান্য করে। লোকটি কিন্তু ব্যাপারটা জানে বলেই ডান হাতের দস্তানা খুলে কুকুরটার আঙুলের ফাঁক থেকে বরফের কুটিগুলো

সরিয়ে দেয়। দস্তানাটা আবার পরে নিতে মিনিট খানেকের বেশি লাগে নি কিন্তু লোকটি অবাক হয়ে দেখে ইতিমধ্যেই আঙুলগুলো অবশ্য হয়ে গেছে। সত্যিই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আছ। তাড়াতড়ি দস্তানাটা গলিয়ে নিয়ে বুকের ওপর সজোরে একটা ধাক্কা কষায় অবশ্য ডান হাতটা দিয়ে।

ঠিক বারেটার সময় আকাশের উজ্জ্বলতা সবচেয়ে বেশি হয় কিন্তু সূর্য তার শীতকালীন সফরের পথে এখন সুদূর দক্ষিণে পৌঁছে গেছে তাই দিগন্ত আর উজ্জাসিত হয়ে ওঠে না। সূর্য আর হেলদারসন বাড়ির মাঝখানে পৃথিবীর ফুলা পেটটা একটা অবরোধ সৃষ্টি করেছে। মাঝে দুপুরে মেঘমুগ্ধ আকাশের নিচে হেঁট চলেছে লোকটি কিন্তু মাটিতে তার ছায়ার বেশও পড়ছে না। কীটায় কীটায় বারো বাড়ির মধ্যে বাড়ির সামনে লোকটি হেঁদারসন বাড়ির দ্বিধাবিহীন মুখ্যায় এসে পৌঁছান। নিজের হাঁটার গতি দেখে নিজেই খুব সন্তুষ্ট। এভাবে ইটতে পারলে ছ'টার মধ্যেই নিশ্চয় দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। জ্যাকেট আর জামার বোতাম খুলে দুপুরের বাবারটা বের করে আনে। সেকেন্ড পনেরের বেশি সময় লাগে নি কাছাকাছি সারতে কিন্তু তারই মধ্যে উদ্ভুক্ত আঙুলগুলো অবশ্যতার শিকার হয়ে গেছে। দস্তানাটা না পরে প্রায় বার বার হাতটা সে সজোরে ধাক্কা ডান পায়ের ওপরে। তারপর তুষার জমা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে যাবে বলে। পায়ে থালাই মারার জন্যে যে শিরশিরে বাষ্পটা প্রথমে অনুভব করেছিল দেখতে দেখতে সেটা কমেই ওঠে। এত দ্রুত আঙুলগুলোকে আবার অবশ্য হতে দেখে চমকে যায় লোকটি। বিস্কুট একটা কামড় বসাবারও সুযোগ মেলে নি। ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে আবার বার কয়েক থালাই কষিয়ে দস্তানাটা এবার গলিয়ে নেয়। এবার বা হাতের দস্তানাটা খুলেছে বাবে বলে। কিন্তু বিস্কুট মুখে পোরা গেল না। তার বরফজমা ঠোঁট ফাঁক হল না। আগেই আগুন জ্বলে গাছের বরফ গলিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। নিজের নিমুজিতায় নিজেই লজ্জা পায় লোকটি। ইতিমধ্যে বা হাতের আঙুলগুলো অসাড় হতে শুরু করেছে। লোকটি আরো অনুভব করে যে পাছের গুঁড়িটার ওপরে চড়ে বহাবার সময় পায়ের আঙুলগুলো চিনচিন করে উঠেছিল কিন্তু এখন আর করছে না। তাহলে কি পায়ের আঙুলগুলোও অসাড় হয়ে গেল! পরীক্ষামূলকভাবে মোকাসিনের মধ্যে আঙুল নাড়িয়ে দেখল সত্যিই অবশ্য হয়ে গেছে ওগুলো।

দ্রুত দস্তানা পরে উঠে দাঁড়ায় সে। আতঙ্ক স্পর্শ করেছে ওকে। জোরে জোরে মাটির ওপর পা ঝুঁকতে শুরু করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ব্যথার অনুভূতি ফিরে আসে। লোকটি ভাবে সত্যিই এমন ঠাণ্ডা সন্ধ্যার দেখা যায় না। সালকার বাড়ির ওখানে সেই লোকটা ঠিকই বলেছিল। এ অঞ্চলের শীতের প্রকোপ মাঝে মধ্যে এমন দুঃসহ হয়ে ওঠে। তখন লোকটার কথা ও হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। এক থেকেই বোঝা যায় সব বিষয়ে নিজের বুশিমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুভূতি। আজকের শীতলতা সম্পক্ষে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারবে না। লোকটি আগু পিছু ছোটাছুটি শুরু করে দেয়, মাটিতে পা ঠোকে জোরে জোরে, হাত দিয়ে অনবরত চাপড় মারে। শেষ পর্যন্ত অনুভূতি ফিরে এসেছে বুক নিশ্চিন্ত হয়ে আগুন জ্বালাতে দেশলাই বের করে। গত বছর বসন্তের সময় জোয়ারের জলে ভেসে আসা ভালপালা কাছেই এক জায়গায় জমা হয়েছিল। সেখান থেকেই ও আগুন জ্বালার কাঠ পেয়ে যায়। দু'একটা গাছের ডালে আগুন ধরিয়ে নেয় প্রথমে, তারপর সেটা গনদনে আগুনের এক চুল্লিতে পরিণত হয়। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে মুখের ওপর জমা বরফ গলিয়ে নেয়, তারপর সারে দুপুরের বিস্কুট খাওয়া। কিছুক্ষণের জন্য শীতলতা পরাণ্ত হয়। কুকুরটাকে সন্তুষ্ট মনে যতদূর সম্ভব আগুনের দোর ধৈর্যে পা ছড়িয়ে বসে।

বাওয়া শেষ করে পাইপে তামাক ভরে বেশ আমেজের সঙ্গে ধূমপানের পর্ব সাজ করে উঠে দাঁড়ায় লোকটি। দস্তানা দুটো খুলে কানচাকা টুপিটাকে বেশ ভালো করে টেনে দেয় দু কানের ওপর, আবার শুরু হয় হাঁটা। কুকুরটা হতাশ হয়ে বারবার সতৃষ্ণ নয়নে পিছন ফিরে ফিরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকাচ্ছে। এই লোকটার শীত সম্পর্ককে কোনো ধারণাই নেই। হয়ত তার বংশের কেউ কোনোদিন প্রচণ্ড শীতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নি। তাপমাত্রা হিমাক্ষের একশো সাত ডিগ্রি নিচে এই কথাটার অর্থ বোঝার সুযোগ পায় নি নিশ্চয়। কুকুরটা কিন্তু এর অর্থ বোঝে, তার পূর্বপুরুষরাও সবাই বুঝত। তাই এই জ্ঞান সে উত্তরাধিকার সূত্রে আহার্য করেছে। কুকুরটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় পঞ্চালার কোনো মানেই হয় না। এখন তুষারের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে দুপটি করে তার মধ্যে ঢুকে বসে থাকার কথা। তারপর আকাশে মেঘ ঘনালে বায়ু প্রবাহিত শীতের প্রকোপ যখন আসে আসবে তখন আবার শুষ্ক কব্জা উঠিত পন্থায়া। কিন্তু কুকুর আর লোকটির মধ্যে কোনো সম্ভাব নেই। কুকুরটি ওর জীতদাস। যা বলা হয় ওকে তাই করতে হয় আর আদর বলতে জোটে শুধু চাবুকের ঘা আর কর্কশ কঠোর শাসনি। এই জনেই কুকুরটি তার চিন্তার কথা মানুষটির কাছে প্রকাশ করার কোনো সুযোগই পায় না। শুধু মানুষটির মঙ্গলের কথা ভেবে ও পিছন ফিরে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকায় নি। তাকিয়েছিল নিজের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই। লোকটি কিন্তু সৌন্দিক কোনো আমল না দিয়েই শিশু দিয়ে আর হিহিস শব্দে চাবুক মারার মতো করে ওকে শাসিয়ে ওঠে। কুকুরটি সঙ্গে সঙ্গে কাছে চলে এসে আবার পিছনে পিছনে শুরু করে ছুটতে।

লোকটি আবার খেনি পোরে মুখে। সঙ্গে সঙ্গে গজাতো শুরু করে স্ফটিকের নতুন দাড়ি আর ভিজ়ে নিশ্বাস মুহূর্তের মধ্যে গৌণ, ভুরু আর চোখের পাতায় সাদা পাউডার হয়ে জমতে থাকে। হেডারসনের বা ফালিতে আগের মতো ঝরনা নেই। প্রথম আধ ঘন্টায়ে তা একটাও ঝরনা চোখে পড়ে নি। কিন্তু তারপরেই দুর্ঘটনাটা ঘটল। জায়গাটা দেখে কিছু বোঝবার উপায় ছিল না। নরম তুষারের অবিশ্রাম আন্তর্য নিম্নাংগের কঠিনতার কথাই ঘোষণা করছিল। হঠাৎ ভূমুন্ড করে জলের মধ্যে পড়ল লোকটি। গর্তটা খুব গভীর নয়। কোনোকম মনে নিজেকে টেনে হিচড়ে কঠিন জায়গার ওপর এসে উঠল যখন, হাঁটু অবধি ভিজ়ে গেছে।

রাগত কঠে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে লোকটি। ছটার মধ্যে শিবিরে পৌছতে পারবে ভেবেছিল। এখন আরো এক ঘন্টা দেরি হয়ে গেল। আগুন জ্বলে পায়ের জুতো মোজা সব শুকিয়ে নিতে হবে। এত নিম্ন তাপমাত্রায় এটা বায়ুতামূলক। দিক পরিবর্তন করে লোকটি পাড়ের ওপর উঠে আসে। পাড়ের ওপর কয়েকটা ছোট ছোট গাছের গুঁড়ির চারদিক ঘিরে গজানো ঘোষাপাড়ের গায়ে এসে আটকে রয়েছে বেশ কিছু ছালানি কাঠকুটো। গ্রীষ্মকালে জোয়ারের জলে ভেসে এসেছিল। কাঠকুটোর মধ্যে বড়সড় কিছু ডালপালাও আছে। আর আছে, গত বছরের শুকনো পাতার রাশি। বরফের ওপর প্রথমেই ও কটা বড়সড় ডাল বিছিয়ে দেয়। তা না হলে আগুন জ্বালা মাত্র বরফ গলে সব ছাল চূবে নিতে যাবে। পকেট থেকে বাকি গাছের একটা ছাল বের করে, কাগজের টুকরোর চেয়েও এতে দ্রুত আগুন ধরে। জ্বলন্ত টুকরোটাকে বড় ডালপালার ওপর রেখে ও ছালও তার ওপর শুকনো ঘাস আর ছোট-ছোট ডালপালা চুরাত শুরু করে।

অত্যন্ত সতর্কভাবে ধীরেসুস্থে ও কাজ করে চলে। আশু বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। আগুনের শিখা আকারে জমে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় দেখে ডালপালা গুঁজে যায়

লোকটি। তুষারের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে। ডালপালার জঞ্জাল থেকে একটা করে ডাল টেনে নিচ্ছে আর সটান গুঁজে দিচ্ছে আগুন। ও জানে এখন কোনোমতেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না। তাপমাত্রা যখন শূন্য থেকে পঁচাত্তর ডিগ্রি নিচে নেমে যায় তখন আগুন জ্বালাবার প্রথম প্রচেষ্টায় বিফল হওয়া মারাত্মক। বিশেষ করে তার পা দুটো যদি ভিজ়ে থাকে। পা যদি ভিজ়ে না থাকে তাহলে আগুন জ্বালাতে না পারলেও আধ মাইল ছুটে রক্ত সঞ্চালন ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু ভিজ়ে বরফজমাট পায়ের রক্ত সঞ্চালন শুধু ছুটে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তাপমাত্রা এখন হিমাঙ্ক ছাড়িয়ে পঁচাত্তর ডিগ্রি নেমে গেছে কাজেই যত জোরেই ছুটুক না কেন ওর ভিজ়ে পা জমাট ধাবেই।

লোকটি এসব কথা ভালোভাবেই জানে। গন্ধক বাড়ির অভিজ্ঞ লোকটির কাছে গত বছর এসব গল্পই শুনেছে। লোকটিকে মনে মনে ধন্যবাদ জানায় ওকে এই ব্লু-কুপার উপদেশ দেওয়ার জন্যে। ইতিবাচ্যেই তার পায়ের অনুভূতি লোপ পেয়েছে। আগুন জ্বালাবার জন্যে দস্তানা খুলতে বাধ্য হয়েছিল বলে আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেছে। এতক্ষণ ঘন্টায় চারমাইল বেগে হাঁটছিল তাই হ্রস্পিগুটা রক্ত পাম্প করে পাঠাঙ্কল শরীরে গেছে কমে। মহাশূন্য থেকে বারো পায়ে পড়তে শীতলতা—পৃথিবীর এই অনাচ্ছাদিত শীর্ষাঞ্চলে প্রচণ্ড তার দাপট। আর সেই ভয়ঙ্করের দাপটে তার দেহের রক্তও যেন ভয় পেয়েছে। ঠিক কুকুরটার মতোই বোধহয় জ্যান্ত তার দেহের রক্ত। তাই কুকুরটার মতো রক্তও চাইছে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে লুকিয়ে পড়তে। ঘন্টা পিছু তার মাইল করে হাঁটার সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কিন্তু এখন তাতে ভীটা পড়েছে, তার দেহের অঙ্গরমহলের কোনো এক ফোকরে গিয়ে সব জমা হয়েছে। অঙ্গের প্রান্তভাগগুলো প্রথম টার পেয়েছে রক্তের এই অনুপস্থিতি। ভিজ়ে পা দুটো দ্রুত থেকে দ্রুততর জমে যাচ্ছে, বোঝার আঙুলগুলো জমে না গেলেও ক্রমশই আগুনের বাহিরে চলে যাচ্ছে। নাক আর গালও জমতে শুরু করেছে। সারা গায়ের চামড়া হিশ্শীতল হয়ে উঠছে রক্তসঞ্চালন কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু ওর আর ভয় নেই। আঙুল, নাক আর গালটোতেই যা তুষার ক্ষত হবে। আগুনটা বেশ গগনন করে জ্বলছে। আঙুলের মতো চিকন দেখে ডাল সরবরাহ করছে এখন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই কঙ্কির আকারের ডাল গুঁজতে পারবে। তখন ভিজ়ে জুতো মোজা খুলে ফেলতে পারবে। যতক্ষণ না সেগুলো শুকনো হচ্ছে নুণা পা দুটো আগুনের ধারে রেখে বৈকল্য। বলাই বাহুল্য তার আগে বরফ দিয়ে পা দুটো খানিকক্ষণ ঘষে নিতে হবে। আগুনটা ভালোভাবে জ্বলছে। ও এখন নিরাপদ। গন্ধক-বাড়ির প্রবীণ লোকটার কথা মনে পড়তেই ওর হাসি পায়। লোকটি খুব জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিল যে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রি নেমে গেলে এই ব্রুনডাইকে কারুর একা পথে বেরোনো উচিত নয়। কিন্তু এই তো ও এখানে এসেছে, একাই এসেছে এবং দুটিনায়ও পড়েছে, তবু নিজেকে ঠিক বাঁচিয়েছে তো। আসলে যারা গরম না করলে কোনো বিপদই বিপদ নয়। পুরোনো দিনের লোকগুলোয় একটু মেয়েলি স্বভাব হয়। মরদের মতো মরদ হলে যে কেউ একা পথে বেরোতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে যে তার নাক আর গাল দুটো অত্যন্ত দ্রুত জমে যাচ্ছে। এত অস্তি সময়ের মধ্যে তার আঙুলগুলো যে শ্রাণ হারিয়ে ফেলবে ভাবতেও পারে নি। লজ্জি কোনো অনুভূতি নেই আঙুলে। কোনোকম আগুন দিয়ে এখন মুঠো করে ডাল ধরতে পারছে। নাজাত্যা করা প্রায় দুশস্য। মনে হচ্ছে আঙুলগুলো

যেন তার নিজের দেহের অংশ নয়। একটা ডাল ছুঁয়ে গুঁকে বেশ ভালো করে নজর দিতে হচ্ছে যে সতিহই সে ডালটা মুঠো করে ধরেছে কিনা।

তবে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। আগুন তো জ্বলছেই। চটচড় শব্দ হচ্ছে অগ্নিকুণ্ডে আর তার প্রতিটি নৃত্যরত শিখা যেন জীবনের বক্ষ শপথ নিচ্ছে। লোকটি তার বোকাসিনে জুতো খুলতে শুরু করে। পুরো জুতোর ওপরেই কঠিন বরফ জমেছে। মাঝেমাঝে অবধি টানা মোটা জার্মান মোজাগুলা যেন লোহার পাত আর বোকাসিনের কিত্তেগুলা যেন প্যাচানো লোহার রড। অবশ্য আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ টানাতানি করেই ও নিজের বোকাসিন কথা বুঝে পকেট থেকে ছুরিটা বের করে নেয়।

কিন্তু ফিতে কাটার আগেই ব্যাপারটা ঘটে। দোষটা ওরই। অবশ্য দোষ না বলে ভুল বলাই ভালো। গাছের তলায় আগুন জ্বলছে না ঠিক হয় নি। ফাঁকা জায়গায় আগুন জ্বালানো উচিত ছিল। কিন্তু ঝোপ থেকে ডালপালা টেনে সোজা আগুনে গুঁজে দেবার সুযোগটা ছিল এখানে। যে গাছটার তলায় ও আগুন জ্বলেছে তার প্রতিটি ডালপালার ওপরেই জমে ছিল তুষার। কয়েক সপ্তাহ ধরে যেটোই বাতাস বয় নি, তাই ডালপালাগুলোর ওপর তাদের ভার বহনের শেষ সীমা অবধি তুষার জমেছে। যতবার একটা করে ডাল টেনেছে সামান্য কাঁপুনি লেগেছে গাছটায়। সেটা ওর চোখে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হলেও দুখটানা বাধানার পক্ষে যথেষ্ট। গাছের ওপর দিকের একটা ডাল থেকে হঠাৎ বারে পড়ল বরফের বোঝা। বারে পড়া বরফের বোঝা এসে পড়ল নিচের ডালগুলোর ওপর, আর সেগুলো থেকে বারে পড়ল আরো তুষার আরো অনেক ডালের ওপর। এই প্রক্রিয়া দ্রুত বিস্তার লাভ করল সারাটা গাছ জুড়ে। বিনা সন্দেহে হঠাৎ এক তুষার প্রপাত সৃষ্টি হল। আগুনের ওপর ধ্বংসে পড়ল রাশি রাশি স্থূপ তুষার। দেখলে বোঝা যাবে না যে একটু আগেও এখানে অমন গনগনে আগুন জ্বলছিল।

লোকটি স্তম্ভিত। এ যেন স্বকর্ণে নিজের মৃত্যুদণ্ডদেশ শোনা। নির্বাণিত অগ্নিকুণ্ডটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বসে রইল ও মুহূর্তক্ষণ। তারপর সমস্ত অস্থিরতা একেবারে শান্ত হয়ে এল। গন্ধক-বাড়ির লোকটা বোধহয় ঠিকই বলেছিল। এখন একজন সঙ্গী থাকলে কোনো বিপদ হত না। সেই আবার আগুন জ্বলতে হবে। এবার আর ব্যর্থ হলে চলবে না। অবশ্য আগুন জ্বলতে পারলেও পায়ের কয়েকটা আঙুল বোধহয় খোঁয়াতেই হবে। ইতিমধ্যেই পা দুটো বেশ জমে গেছে। আগুন জ্বলতেও তো বানিকটা সময় লাগবে।

লোকটি কিন্তু নিক্ষেপের মতো শুধু বসে বসে চিন্তাভাবনা যা ভাসায় নি। এই সময়টুকুর মধ্যেই সে আরেকটা আগুন জ্বালবার প্রস্তুতি নিয়েছে। এবার কাঠকটো জড়ো করেছে ফাঁকা জায়গাতেই। এবার কোনো গাছ আর সমতানি করে আগুন নেভাতে পারবে না। নদীর উঁচু পাড় থেকে শুকনো ঘাস আর ছোট ছোট ডালপালা সংগ্রহ করতে এগিয়ে এসেও মুশকিল পড়তে হয়। আঙুলগুলোকে কিছুতেই বশ মানাতে পারছে না, বাহ্যিক করে তুলবে কী করে ঘাস বা ডালপালা! শেষে মুঠো ভর্তি করে যা পারে তুলে নেয়। কিছু অব্যাহতি পচা ডালপালা আর কাঁচা ঘাসও উঠে আসে। কিছু করার নেই। নিয়মানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। এমন কি কতকগুলো বড় ডালও হাতের কাছে যোগাড় করে রেখেছে আগুন ভালো করে ধরার পর গুঁজে দেবে বলে। ওর ওপর নজর রেখে চুপ করে বসে আছে কুকুট। অধীর আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ তার দৃষ্টিতে, কারণ লোকটিই তাকে যোগাড় করে এনে দেবে আগুন। কিন্তু বন্ধ দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয় লোকটি। বাঁচ গাছের শুকনো

আরেক টুকরো ছাড়া আছে পকেটে। ছালটা আঙুলে ঠেকেছে, বড়খড় শব্দ শুনতে পাচ্ছে কিন্তু তবু কিছুতেই আর ধরতে পারে না। একদিকে নিরলস প্রয়াস অন্যদিকে সারাক্ষণের মানসিক দশনে যে প্রতি মুহূর্তেই তার পা দুটো আরো জমে যাচ্ছে। এই চিন্তাটা তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলতে চাইছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে ও সফল লড়াই চালিয়ে শাস্তভাব বজায় রেখেছে। দাঁত দিয়ে হাতের দস্তানা দুটো খিমচে ধরে তান মেরে খুলে নেয়। হাত দুটো দুলিয়ে দুলিয়ে সজোরে পায়ের ওপর আঙুল দিয়ে বাড়ি মারে অনুভূতি কিরিয়ে আনতে। প্রথমে বসে বসে মারছিল তারপর উঠে দাঁড়িয়ে। কুকুটটা সেই বরফের মধ্যে বসে আছে। লোমশ লেজটা পেঁচিয়ে রেখেছে সামনের পা দুটো ঢেকে। নেকড়ের মতো ছুঁচোলা কানদুটো সামনের দিক করে খাড়া—উৎকর্ণ। মানুষটির কার্যকলাপ দেখেছে। লোকটি আঙুলের অনুভূতি কিরিয়ে আনার চেষ্টা করে আর কুকুটটাকে দেখে তার হিসেব হয়। কেমন লোমের স্বাভাবিক আবরণে তলায় উষ্ণতার আমেজ পোয়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে হাতের আঙুলগুলোয় সে অনুভূতি ফেরার একটা সুদূরবর্তী অনুভূতির প্রথম স্কেতে পেল। মধু দশদপানিটা ক্রমে তীব্র বেদনার রূপ নেয় কিন্তু লোকটি তাতে খুশিই বেধে করে। ডান হাত থেকে দস্তানাটা খুলে পকেট থেকে গাছের ছালের টুকরোটা বের করে আনে। খোলা আঙুলগুলো আবার দ্রুত অবশ হয়ে আসছে। গন্ধক দেশলাইগুলোর বাম্ভিলটাও এবার বের করেছে। বাম্ভিল থেকে একটা কাঠি আলাদা করতে গিয়ে পুরো বাম্ভিলটাই পড়ে গেল বরফের ওপর। কাঠিগুলোকে বরফ থেকে কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল পায়ে না। তীব্র শীত তার আঙুলের গ্রাণ হরণ করেছে। তবু আঙুলগুলো কিছু ছুঁতে পারছে না, ধরতেও পারছে না। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে জমট বাঁধা পা, নাক আর গালের সব দিক্খাটা মন থেকে সরিয়ে একত্রাণিভে দেশলাই পুনরুদ্ধারে উঠে পড়ে লাগে। স্পর্শানুভূতির অভাব দৃষ্টিশক্তিকে ব্যবহার করে পূরণ করে নিতে চায়। দেশলাইয়ের বাম্ভিলটার দ্বারা আঙুলগুলো পৌঁছেছে দেখে আঙুলগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে। না, বলতে ভুল বল—আঙুলগুলো মুঠো করারই হচ্ছে ছিল তার, কিন্তু আঙুলগুলো তার নির্দেশ মানে নি। ডান হাতের দস্তানাটা গিলিয়ে নিয়ে লোকটি এবার হাঁটু ওপর কাপালর মতো একটা ধান্ডা কষায়। দস্তানা পরা দুহাত দিয়ে এক রাশ বরফ সমেত দেশলাইয়ের বাম্ভিলটা তুলে নিয়েছে কালে। তবু কোনো লাভ হয় নি।

একটু পরে কোনোক্রমে বাম্ভিলটাকে সে দস্তানা পরা দু হাতের চোঁটার মধ্যে চেপে মুখের কাছে টুঁচ করে ধরল। তীব্র চাপ দিয়ে মুখ ফাঁক করতেই কড়মড় শব্দে জমটি বরফগুলো ফটিয়া যায়। নিচের চোঁটাটা মুখের ভেতর দিকে মুড়ে ওপরের গিলির দাঁত দিয়ে বাম্ভিল থেকে একটা কাঠিকে আলাদা যদি বা করল, কাঠিটা মুখ থেকে খসে পড়ল কালে। কিছুতেই আর কুড়াতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মুখ নামিয়ে দাঁতে করে চেপে কাঠিটাকে তুলে আনল। দাঁতে করে চেপেই কাঠিটাকে ঘষতে শুরু করল পায়ের ওপর। একবার দুবার তিনবার মতো একটু ধান্ডা কষায়। দস্তানা পরা দেশলাই জ্বলল। জ্বলন্ত দেশলাইটা দাঁতে চেপেই গাছের ছালটায় আগুন ধরাবে ভেবেছিল কিন্তু বিচ্ছিন্ন ধোঁয়াটা নাক হয়ে একবারে ফুসফুসে গিয়ে পেরিয়েছে। আচমকা কাশির দমকে দিশেহারা হাতই কাঠিটা বরফের ওপর খসে পড়ে নিভে গেল।

সালকার ফ্রিকের অভিজ্ঞ সাজাত ঠিকই বলেছিল। এখন সে কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। হিমাক্ষের পঞ্চাশ ডিগ্রি নিচে সঙ্গী ছাড়া পথে বেরোনো উচিত নয়। হাত দুটো বারবার কুঁকো কোনো অনুভূতি কিরে পায়ে না। হঠাৎ ও দাঁতে চেপে দস্তানাটাকে দু

হাতের চোটের মধ্যে চেপে ধরল। হাতের পেশিগুলো জমে যায় নি বলেই পেরেছে। এবার পুরো বাম্ভিলাটাকে পায়ের ওপর ঘষতেই এক সঙ্গে সমুদ্রটা দেশলাই কাঠি দগ্ধ করে জ্বলে উঠল। একটুও হাওয়া নেই তাই নেভার ভয়ও নেই। শ্বাসরোধকারী ধোঁয়া এড়াবার জন্যে লোকটা মাথাটা একটু কাত করে রাখে। গাছের ছালটা বাড়িয়ে ধরে জ্বলন্ত কাঠিগুলোর ওপর। এতক্ষণে হাতে একটা অসুস্থিতি পায়। হাতের চামড়া পুড়ছে। নাক আসছে পোড়া গন্ধটা। চামড়ার তলায় প্রথম পাওয়া অনুভূতিটা ক্রমশ যন্ত্রণার রূপ নেয়। যন্ত্রণা ক্রমশ তীব্রতর হয়ে ওঠে। তবু দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণার কথা ভুলে গাছের ছালটায় অগ্নিসংযোগ করতে চায়। সহজে ধরতে চায় না ছালটা। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির আগুনের বেশির ভাগ তাপটাই ধরত হয়ে যাচ্ছে তার হাতের ছাল চামড়া মাংস পোড়বার কাজে।

সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে এক ঝটকায় হাত দুটো ফাঁক করল লোকটি। জ্বলন্ত কাঠিগুলো বরফের ওপর পড়ে চড়বড় করে উঠে নিতে গেল। গাছের ছালটায় কিন্তু আগুন ধরে গেছে। এক এক করে শুকনো ঘাস আর ছোট ছোট ডালপালাগুলোকে সে আগুনের মধ্যে গুঁজতে শুরু করল। মুশকিল হচ্ছে ওর পেছা তেমনভাবে বাছাই করা সম্ভব নয়। দুহাত এক করে তালুর মধ্যে চেপে ডালপালাগুলো ভুলে নিতে হচ্ছে। তাই পচা কাঠের ছোটে ছোট টুকরো আর কাঁচা ঘাসও লেগে থাকছে অনেক ক্ষেত্রেই। যতটা পারে দাঁত দিয়ে কামড়ে সে ওগুলোকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আগুন জ্বলবার ভয়মিটি যতই অস্বস্তি হোক সতর্কতার কিন্তু কমতি নেই। এখন আগুনও যা জীবনও তাই। কিছুতেই আগুন নিভতে দেওয়া চলবে না। দেহের বহির্ভাগে রক্তশূন্যতার দরুন লোকটি এবার কাঁপতে শুরু করে। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আরো হ্রাস পায়। এবার অগ্নিকুণ্ডের ঠিক ওপরে খসে পড়ে কাঁচা ঘাসের বেশ বড়ো একটা চান্ড। আঙুলে করে ঘাসটাকে সরিয়ে দিতে চায় কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটে। নিয়ন্ত্রণহীন আঙুলটা আগুনটাকে বেশি ঘেঁটে ফেলে। জ্বলন্ত ঘাস আর ছোট ছোট ডালপালাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এবার সেগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেও তাকে হার কবির করতে হয়। হাত পা এমনই ঠক ঠক করে কাঁপছে। ছড়ানো ডালপালাগুলো এক এক করে কালো ধোঁয়া ছাড়ে আর নিতে যায়। আগুন আর জ্বালা হয় না। তার অসহায় করুণ চোখের দৃষ্টি হঠাৎ গিয়ে পড়ে কুকুরের ওপর। নিহত অগ্নিকুণ্ডের ওধারে বরফের ওপর বসে রয়েছে। অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে তার অন্তর্ভুক্তিতে। একবার সামনের ডান পাটা একটু উঁচু করেছে তাঙ্গর আবার বাঁ পাটা। ব্যাকুল আগ্রহে একবার এ পা আর একবার ও পায়ের ওপর দেহের ওজন রাখছে।

কুকুরটার দিকে তাকাতেই একটা উদ্ভাদ চিন্তা তার মাথায় ডিঙ করে। গল্পে পড়েছিল একটি লোক একবার তুষার-বৃষ্টির মধ্যে আঁকড়া পড়ার পর একটি হরিণ মেরে তার শব্দেদের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকবে নাকি তার প্রাণ বিচিৎয়েছিল। ঠিক এমনভাবে কুকুরটাকে খুন করে ওর গরম শরীরের মধ্যে হাত দুটো গুঁজে রাখা যেতে পারে। কিছুক্ষণ বাদে নিশ্চয় অবশ ভাবটা কেটে যাবে। তখন সে আবার আগুন জ্বলতে পারবে। কুকুরটাকে ও কাছে ডেকে কিন্তু তার শব্দাঙ্কিত অস্বস্তি কব্ধর শব্দে জঙ্কটিও ভীতি বোধ করে। এমনভাবে লোকটিকে কবনও কটা বলতে শোনে নি। আবার প্রাণীও বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে। ব্যাপারটা ঠিক কিনা পরোপরি বুঝতে না পারলেও, তার সন্দেহস্থল মতো বিপদের গন্ধ পায়। লোকটির ডাক শোনা মাত্র কুকুরটা তার খাড়া কান নামিয়ে নেয়, তার অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায়। সামনের পা দুটো আরো ঘন ঘন নাড়ে কিন্তু লোকটির ডাক আসার বিদ্যুদ্ভ্রাত আগ্রহ অনুভব করে না। লোকটি এবার চান হাত পায়ে হামাগুড়ি

দিয়ে এগোবার চেষ্টা করে। আর এই বিচিত্র ভঙ্গি দেখে কুকুরটার সন্দেহের মাত্রা আরো বাড়ে। কুকুরটা খানিক দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

লোকটি বরফের ওপর বসেই মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে চেষ্টা করে। দাঁত দিয়ে টেনে দস্তানা দুটো হাতে গুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পায়ের কোনো অনুভূতি নেই তাই ভালো করে জমির দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে হচ্ছে, সত্যিই সে নিজের পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিনা। লোকটির স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখেই কুকুরটির সন্দেহের ভাবটা হাল্কা হয়ে আসে। সেই সুপরিস্থিত প্রভুত্ববাজ্ঞক শাসানি কানে যেতেই সে স্বভাবসুলভ আনুগত্যে লোকটির দিকে এগিয়ে আসে। কুকুরটাকে হাতের নাগালে পেতেই সে আচমকা দুহাত বাড়িয়ে কুকুরটার টুটি টিপে ধরতে যায়। পরক্ষণেই তার বিশ্ময়ের অস্ত থাকে না। অবশ আত্মলগ্নোতা আর ভাঙ্ক কশা যাচ্ছে না। কিছু টিপে ধরারও সম্ভব নয়। ব্যাপারটা মূর্ছবৃত্তের মধ্যে ঘটে যাওয়ার কুকুরটা পালাবার সুযোগ পায় নি। দুহাতে কুকুরটাকে জাপটে ধরে লোকটি বরফের ওপর বসে পড়ে। ক্ষুধা কুকুরটা রাগে গরগর করে ওঠে। বাঁধন ছাড়াবার জন্যে গায়ের জোঁর খাটায়।

কুকুরটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বসে থাকা ছাড়া লোকটির আর কিছু করার নেই। পরিকার বুঝতে পারছে কুকুরটাকে মারা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ অকোজো আঙুল দিয়ে না ধরতে পারবে ঘুরি, না পারবে টুটি টিপে মারতে। তাই হাতের বাঁধন আঁপা করে দিতেই কুকুরটা পাগলের মতো পেটের মধ্যে লেজ পুরে ছুটে পালাল। চল্লিশ ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়াল কুকুরটা। সন্ধিহু দৃষ্টিতে কান খাড়া করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল লোকটিকে।

লোকটি তার হাত দুটোর দিকে চোখ ফেরায়। হাত দুটো শরীরের দুপাশে ঝুলে। ভাবতেই অবাক লাগে যে চোখের নজরের ওপর নির্ভর করে তাকে এখন হাত দুটো কোথায় রয়েছে সেই খোঁজ নিতে হচ্ছে। আবার হাত দুটোর দুলিয়ে পায়ের ওপর বাড়ি মারতে শুরু করে। এক নাগাড়ে মিনিট পাঁচেক ধরে প্রাণপন্থে খান্ডিত মেরে বানিকটা সুফল মেলে। হৃৎপিণ্ডের কৃপায় শরীরের উপরিভাগেও কিঞ্চিৎ পরিমাণ রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় কাঁপুনিটা বন্ধ হয়েছে। হাতে কিন্তু কোনো অনুভূতিই সঞ্চারিত হয় নি। দুটো পাল্লার মতো হাত দুটো তার দুহাথের প্রান্তে ঝুলছে বলে মনে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই ধারণার সম্মুখে অনুভূতির বিদ্যুদ্ভ্রাত সাহায্য করছে না।

এবার মৃত্যুভীতি তাকে গ্রাস করতে শুরু করে। ভয়টা আতঙ্কের রূপ গ্রহণ করতে দেরি হয় না। স্পষ্ট বুঝতে পারছে কুকুরটা এখন আর শুধু হাত ও পায়ের কটা জমে থাকা আত্ম আত্মা খোঁয়া যাওয়ার মধ্যেই সীমিত নেই। প্রশ্নটা জীবন-মৃত্যুর এবং পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রতিকূল। ত্রাসে আতঙ্কে ক্ষিপ্তপ্রায় লোকটি অকস্মাৎ দৌড়াতে শুরু করে অবস্থা পুরানো পথেরা ধরে। উদ্দেশ্যবিশিষ্ট, সিদ্ধিহীন জ্ঞানশূন্য। ভয়ই তাকে এমনভাবে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জীবনে সে কখনো এমন ভয় পায় নি। তুষারের মধ্যে ছুটতে গিয়ে নাকাল হতে হয় পদে পদে। খানিকক্ষণ বাদে আবার সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। ওই ভোে ঝাঁড়ির কিনারা—গুঁড়ি আটকে আছে নদীর জমাট বৃক্কে—ওই ভোে পাতা-ঝরা পলপার গাছ আর আলো। ছুটে উপকারই হয়েছে। কাঁপুনিটা আরো ছুটলে পায়ের বরফ গলায়, এমন কি বেশ কিছুক্ষণ যদি ছুটতে পারো তো তীব্রতাই গিয়ে হাজির হবে। সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। হাত পায়ের কয়েকটা আঙুল আর মুখের অংশবিশেষ নিশ্চয় হারাত হাবে কিন্তু বন্ধুর তাকে ঠিক প্রাণে বিচাবে। আশার সঙ্গে সঙ্গে

নিরাশার মেঘও মনের কোণে ছায়া বিছোয়। মনে হয় ক্যাম্পের ফেরা আর তার হবে না। পথ তো আর কম নয়। ইতিমধ্যেই সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তুষার-ক্ষত। কিছুক্ষণের মধ্যেই শীতল শরীর কঠিন হয়ে মৃত্যু আসবে। মৃত্যুর চিন্তাটিকে সে মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই একই চিন্তা এসে ভিড় জমায়। তখন সে অন্য কথা ভেবে জোর করে চিন্তাস্রোতকে ভিন্নমুখী করতে চায়।

ভারতে অবাক লাগে যে এখনও সে ছুঁতে পারছে। পা দুটো এখন জমে গেছে যে মাটি স্পর্শ করার অনুভূতিটা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে অথচ এই পা দুটোই তার দেহের ভার বহন করছে। মনে হচ্ছে মাটির সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই, শুধু হাওয়ায় ভেসে চলেছে। কোথায় একবার সে ডানাওলা মার্কারির দেবতার ছবি দেখেছিল। মার্কারির দেবতারও কি একবার লাগে পৃথিবীর ওপর ভেসে যেতে পারত?

ক্যাম্প অবধি ছুটে যাওয়ার চিন্তাটির মধ্যে একটাই বৃত্ত ছিল। ওর সে ক্ষমতা আর নেই। ছুঁতে ছুঁতেই বেশ কয়েকবার হ্যাঁট খায় তারপর একবারে মাথা ঘুরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। এখন একটু বসে জিরিয়ে নেওয়া দরকার। আর ছোট্টা চলবে না, হেঁটে হেঁটেই এগোতে হবে। কিছুক্ষণ বসার পর দল ফিরে পেয়ে লক্ষ্য করে এখন আর আগের মতো শীতল করছে না। কাঁপুনি তো বন্ধ হয়েইছে, এমন কি বুক আর খাঁসেই একটা উষ্ণতার ছোয়া লেগেছে। কিন্তু নাক আর গাল স্পর্শ করে দেখে কোনো অনুভূতি নেই। শুধু ছুঁতে নাক গাল বা হাত কি পা কোনোটারই জমাট ডাব কাটবে না। হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে তার জমাট অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তাম্র শূল হুলে উঠছে। এই নিয়ে ও আর ভাবতে চায় না। চিন্তাটাকে ভুলতে অন্য কথা ভাবতে চায়। না হলে আতঙ্কে দিনাহারা হয়ে পড়তে পারে। চিন্তাটা কিন্তু কিছুতেই ওর সঙ্গে ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত মানস চক্রে ভেসে ওঠে একটা ভূষার জমাট মানুষের ছবি। ছবিটা তারই। অসহ্য—অসহ্য এই চিন্তা। আবার সে পাগলের মতো ছুঁতে শুরু করে। একবার গতি কমিয়ে হাঁটতে গিয়েছিল কিন্তু আবার সেই জমে যাওয়ার ভয় তাকে ছুঁতে বাধ্য করিয়েছে।

কুকুরটা ওর পায়ে পায়ে ছুটছিল। আবার পড়ে যেতেই কুকুরটা ওর সামনে এসে মুণোমুণি বসে পড়ল। লেজটা পেঁচিয়ে সামনের পা দুটো ঢেকে অধীর উৎসুক চোখে চেয়ে আছে। কুকুরটার উষ্ণ দেহ, নিঃসংশয় প্রাণ লোকটিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে। এমন গালিগালাজ শুরু করে যে কুকুরটা তার খাড়া কান নুইয়ে ফেলে। এবার কিন্তু আরো তড়াহুতাড়ি কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। বরফের সঙ্গে লড়াইয়ে সে হেরে যাচ্ছে। শীতলতা অতি সন্তুর্পণ তার দেহের প্রতিটি অঙ্গে অনুপ্রবেশ করছে। লোকটি আবার দৌড় শুরু করে। এঁধার আর একশো ফুটও যেতে হয় না, তার আগেই একেবারে মুখ ধুবড়ে আছড়ে পড়ে। দম আর আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ফিরে পেতেই লোকটি উঠে বসে। ভাবে, মরতেই যদি হয় সসম্মানে মরাই ভালো। আসলে তার একটা উপায়ের কথা মনে পড়ে গেছে। একটা ছিন্ন-মস্তক মুরগির এলোপাখাড়ি ছুটে বেড়ানোর মতোই বোকামি করছে সে। মরতে যখন তাকে হবেই, আর ঠাণ্ডায় জমেই মরতে হবে, তখন ভালোভাবে মরাই তো ভালো। এই নতুন পাওয়া মানসিক প্রশান্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভা ধনিয়ে আসে। ভাবে, এ ঘুম যদি আর না ভাঙে সেই তো ভালো। এ যেন অজ্ঞান করার জন্য শুষ্ক খাওয়াবার পরের অবস্থা। জমে মরাটা এমন কী খারাপ। এরচেয়েও তো কত কষ্টকরভাবে এবং হাজার উপায়ে মরণ আসতে পারে।

ঠিক ছবির মতো চোখের সামনে দেখে পরের দিন তার দলের ছেলেরা এসেছে তার

খোঁজে। দেখে সেই অনুসন্ধানকারী দলের মধ্যে সে নিজেই এসেছে নিজের খোঁজে। সমলবলে এগোতে এগোতে পথের একটা বাক ঘুরেই সে নিজেকে দেখতে পায়। ভূষার শয়নে শায়িত। এখন আর ও নিজের মধ্যে নেই। নিজের বাইরে আর পাঁচজনের সঙ্গে এক হয়ে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে। সত্যিই প্রচণ্ড শীত পড়েছে। আমেরিকায় ফিরে বন্ধুবান্ধবদের বলতে পারবে সত্যিকার ঠাণ্ডা কাকে বলে। চিন্তা প্রবাহে হঠাৎ ছেঁদ পড়ে। সালকার ক্রিকের পুরানো স্যাঙাতের কথা মনে পড়ে যায়। স্পষ্ট দেখতে পায় ও এখন আরামে বসে উষ্ণতার আমেজ পোষাচ্ছে আর পাঁচ টানছে।

'তুমি ঠিকই বলেছিলি যে—ঠিকই বলেছিলে।' সালকার ক্রিকের ঝানু লোকটিকে যেন শোনাতে চায় কথাগুলো।

এতক্ষণে লোকটি ঘুমের কোলে চলে পড়েছে। ঘুমিয়ে যে এত সুখ, ঘুম যে এত আরামের হতে পারে এই প্রথম সে জানল। কুকুরটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ক্ষণস্থায়ী দিবস প্রলম্বিত গোঙলিতে পদার্পণ করল কিন্তু আগুন জ্বালাবার কোনো লক্ষণ নেই। তাছাড়া কুকুরটা এই প্রথম দেখেছে যে আগুন না জ্বেলে কোনো মানুষ বরফের মধ্যে এমনভাবে চূপ করে বসে থাকতে পারে। যতই স্তম্ভা ধনিয়ে আসে আগুনের আকাঙ্ক্ষায় কুকুরটার অস্থিরতা তত বাড়ে। পা দুটো বারবার নাড়ায়। তার চাপা কঠের গোঙানি শুনে লোকটি নিশ্চয় শাসবে বলে আগেভাগেই কান দুটো নামিয়ে নেয়। লোকটি কিন্তু নীরব। কুকুরটা এবার উচ্চস্রবে ডেকে ওঠে। ভবু সাড়া নেই। লোকটার কাছে কয়েক পা চুপিসারে এগিয়ে আসতেই সে মৃত্যুর গন্ধ পায়। কুকুরটা চমকে পিছু হটে আসে। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে বানিকক্ষণ এক নাগাড়ে খেউ খেউ করে। তারাপুলো শীতল আকাশের বুক জ্বল জ্বল করে নাচছে। এবার কুকুরটা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পায়ে হাঁটা পথটা ধরে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে চলে। ও জানে ওখানে অনেক মানুষ আছে। তারা ওকে যেতে দেবে, আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

গল্পের শেষে

এক

এবড়ো খেবড়ো কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি টেবিলটা। যারা টেবিলটায় তাস নিয়ে 'হুইস্ট' খেলছে, তারা মাঝে মধ্যেই নিজেদের দিকে তাস টেনে আনতে অসুবিধেয় পড়ছে। অমসৃণ টেবিলের ওপর আটকে যাচ্ছে তাসগুলো। গায়ের জামা অবধি খুলে বসছে সবাই। তবু মুখের ওপর বিন্দু বিন্দু ধাম জমে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ওদিকে পশমের মোজা ও মোকাসিন পরে থাকলেও পাগুলো ঠাণ্ডায় বেন জমে অসাড় হয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট এই কেবিন ঘরটার মধ্যে আর মেকের মাত্র গজ্বাহেন ও পপের, ঠিক এতটাই তাপমাত্রার প্রভেদ। লোহার পাত দিয়ে তৈরি ইউকোন স্টোভটা গনগন করে জ্বলছে, তবু মাত্র আট ফুট দূরে, দরজার পাশে মেকের একটু ওপরে তাকে রাখা মাংসগুলো জমে একবারে নিরেট হয়ে আছে। নিচের দিক থেকে দেওয়ালের এক-ভূতীয়াশ ছেড়ে কেবিনের দরজাটাও বরফ জমে আটকে আছে। শোবার বন্ধের পিছনে কেবিনের দেওয়ালের কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে সাদা বরফ জমে চকচক করছে। অয়েল পেপারের নিচের দিকটায় ঘরের মানুষদের নির্গত শ্বাস-বায়ু বরফ হয়ে জমে এক ইঞ্চি পুরু আবরণ সৃষ্টি করেছে।

বাঁজি ধরে হুইস্ট খেলা চলাছে ওরা। যে জুটি হারাবে তাকে এই ইউকোনের সাত ফুট পুরু বরফ আর তুষারের স্তর ভেদ করে মাছ ধরার জন্যে গর্ত খুঁড়তে হবে।

'মার্চ মাস পড়ে গেল, তবু এত ঠাণ্ডা।' তাস ভাঁজতে ভাঁজতে বলে উঠল একজন।

'কী মনে হচ্ছে বব?'

'তা মাইনাস পঞ্চাশ বা সাত ডিগ্রি তো হবেই। তুমি কী বল ডাক্তার?'

ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে দরজার তলার দিকে একবার পরীক্ষামূলক দৃষ্টিতে তাকাল।

'পঞ্চাশের বেশি হবে না। উপনক্ষত্র থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। দরজাটার দিকে তাকাও, কতটা বরফ জমেছে দেখলেই বুঝতে পারবে। সেবার যখন মাইনাস সত্তরের নেমে গিয়েছিল তাপমাত্রা, কম করে হলেও আরো চার ইঞ্চি উঁচু অবধি বরফ জমেছিল।'

দরজায় বাইরে থেকে কে যেন দাঁধা দিল। ডাক্তার হাত তুলে তাস বাছতে বাছতেই বল, 'কাম্‌ ইন!'

যে লোকটি ঘরে ঢুকেছে বিশাল চেহারা তার। চওড়া কাঁধ। জাতে সুইডিশ। অবশ্য কানঢাকা টুপিটা খুলে মুখের গোঁফ দাড়ি থেকে বরফ ঝেড়ে না ফেলালে বোঝার উপায় থাকত না সে কোন—দেশের লোক। বরফের মুখোশে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল সব কিছু। আগন্তুক বরফ কেড়ে পরিষ্কার হতে হতেই ওরা হাতের খেলা শেষ করে ফেলল।

'শুনলেই এখানে একজন ডাক্তার এসেছেন।' উৎসুকভাবে প্রশ্ন করল লোকটি। বিচলিত দৃষ্টিতে প্রত্যেকের দিকেই একবার তাকালে সে। দীর্ঘকাল তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে তার রুক্ষ চোখে মুখে। 'আমি বহুদূর থেকে আসছি, হোয়াইয়ার ডান দিকের ফালি থেকে।'

'আমিই ডাক্তার। ব্যাপারটা কী?'

ডাক্তারের কণ্ঠর খেঁই ধরেই লোকটা যেন এবার তার ঝাঁপ হাতটা উঁচু করে ধরল। বীভৎসভাবে ফুলে রয়েছে দ্বিতীয় আঙুলটা। কী করে এমন হল তারই অসলগ্ন কাহিনীটা গড়গড় করে বলতে শুরু করে দিলসে।

'দেখি দেখি, আমায় দেখতে দাও আসে।' অর্ধেক হয়ে বলল ডাক্তার। 'টেবিলের ওপর হাতটা রাখ। এই যে—এইভাবে।'

খুব আলতো করে সত্তর্পণে হাতটা রাখল লোকটি। যেন উলটলে একটা ফোঁড়া—এখুনি ফেটে যাবার ভয় আছে।

'হ্যাভ—' ধমকে ওঠে ডাক্তার। 'এত ঘাবড়াবার কী হল! একশো মাইল পথ তো পায়ে হেঁটে এসেছ সারাবার জন্যেই। ভালো করে দেখো কী করছি, পরেরবার নিজেই করে নিতে পারবে।'

একবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ডাক্তার হঠাৎ তার ডান হাতটা দিয়ে দায়ের মতো সজোরে এক কোপ বসাল লোকটার স্ফীতকায় আঙুলটার ওপর। ত্রাসে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল লোকটি। একটা বুনা জন্তর মতো শোনাল চিৎকারটা। লোকটা সত্যিই বুনা জন্তর মতো প্রায় লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল ডাক্তারের ঘাড়ে। এমন বিনীত রসিকতা সহ্য করা যায়?

'বাস্—বাস্—' ডাক্তারের তীক্ষ্ণ কর্তৃত্বব্যাঞ্জক কণ্ঠস্বর শুকে নিরস্ত করল। 'এখন কেমন লাগছে? ভালো না? লাগতেই হবে ভালো। পরেরবার তুমি নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে পারবে। কই শ্রুদার্স—তাস নাও। এবার তোমাদের হারাবই।'

সুইডিশ লোকটির মুখে খুব ধীরে ধীরে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। ব্যাপারটা একক্ষণে বুঝতে পেরেছে সে। বড়ি খাবার পর আঙুলের যন্ত্রণাটা চলা গেছে, বিনশিত দৃষ্টিতে আঙুলটাকে পর্যবেক্ষণ করে লোকটি—ধীরে ধীরে ভাঁজ করে আর খুলে দেখে পরখ করছে লাগছে কিনা। এবার সে পকেটের মধ্যে হাত পুরে একটা সোনা ভর্তি থলে টেনে বের করল।

'কত দেব?'

ডাক্তার অর্ধেকভাবে ঘাড় নাড়ায়। 'কিছু না, আমি কি প্র্যাকটিস করছি নাকি, কই—তোমার দান বব!'

লোকটি ভারী ভারী পা ফেলে এগিয়ে গেল, আবার লক্ষ্য করল আঙুলটাকে, তারপর সপ্রশংস দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাল।

'খুব ভালো লোক তো আপনি। কী নাম আপনার?'

'লিভে, ডাক্তার লিভে।' শ্রুদার্স উত্তর দেয়, ডাক্তারকে বাড়তি হাদ্‌মা পোয়াবার হাত থেকে যেন বাঁচাতে চাইছে।

'দিনের অর্ধেকই তো কাবার হয়ে গেছে। আজকের রাতটা বরং এখানেই থেকে যাও।' এক রাউন্ড খেলা শেষ হলে ডাক্তার তাস ভাঁজতে ভাঁজতে লোকটিকে বলল। 'এত ঠাণ্ডায় বেরোনা ঠিক হবে না। একটা বাড়তি বাঁজ আছে এখানে, শোবার কোনো অসুবিধে নেই।'

ডাক্তারের পাতলা ছিপছিপে চেহারা। খয়েরি চুল, শ্যামবর্ণ মুখে পাতলা চৌট—একজন বলিষ্ঠ মানুষ। পরিষ্কারভাবে কামানো গালের চামড়া সুস্বাস্থ্যের পরিচয় বহন করছে। অত্যন্ত তৎপর তাঁর প্রতিটি গতিবিধি। তাস ভাঁজছে, বলি করছে, একবারও এলোমেলো হতে দিচ্ছে না। কালো চোখ স্তব্ধেতে অন্তর্ভুক্তি দৃষ্টি। চোখে চোখ রেখে ছাড়া তাকায় না। রোগা কনমীয় হাত দুটো সদা অস্থির। দেখলেই মনে হয় সুস্থ কাজে পারদর্শী সে। হাত দুটোর দিকে তাকালেই তার শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

‘এবার আমাদের দান।’ শেখবাবের মতো তাস টেনে নিল ডাক্তার। ‘দেখা যাক কে হারে আর কে জেতে। কে জানে, কার কপালে আজ গর্ত খোঁড়া আছে।’

আবার দরজায় করাঘাতের শব্দ। এবার কোপে যায় ডাক্তার। ‘আজ আর দেখছি খেলা শেষ করা যাবে না।’ ইতিমধ্যে দরজা খুলে দিতে এক অপরিচিত ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকল।

‘কী ব্যাপার বলে ফেল।’ ডাক্তার আগন্তকের উদ্দেশ্যে বলল।

আগন্তক বৃথাই চেষ্টা করে তার বরফ জমা চৌকি আর চোয়াল কাঁক করার। স্পষ্ট বোঝা যায় বেশ কয়েকদিন ধরে ও একটানা হেঁটেছে। গালের হাড় দুটোর কাছে চামড়াটা কালো হয়ে গেছে বারবার তুষার ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায়। বরফের একটা কঠিন আন্তরণে নাক থেকে চিনুক পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে যা একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে বরফের মধ্যে। এই ফুটোর মধ্যে দিয়ে ও বৈশি খেয়ে থুতু ফেলেছে। তামাক পাতার রস গড়িয়ে গড়িয়ে জমাট বেঁধে একটা খয়েরি রঙা ছুঁতোলা দাড়ি তৈরি হয়ে গেছে।

বোবার মতো লোকটি মাথা নাড়ে। চোখ দুটোয় কৌতূহলের হাসি। বাকশক্তি ফিরে পাবার জন্যে স্টেভটার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। মুখের বরফটা গলিয়ে নেওয়া দরকার। বরফ মুক্ত হবার প্রক্রিয়ায় ক্রমতর করবার জন্যে আঙুল দিয়ে ঝুঁটে আঙুলের বরফের কুটিগুলোকে টেনে ফেলে দেয়। বরফ কুচি স্টেভের ওপর পড়া মাত্র ছ্যাক ছ্যাক করে শব্দ হয়।

‘আমার কিছুই হয় নি।’ শেষপর্যন্ত লোকটি ঘোষণা করল। ‘তবে এখানে যদি কোনো ডাক্তার থাকে তো খুবই উপকার হবে। লিটল পোকাতে একজন লোক খুব অসুস্থ। আসলে একটা চিতাবাঘের সঙ্গে একেবারে হাতাহাতি লড়াই করতে হয়েছিল। নখের আঁচড়ে কামড়ে একেবারে শোচনীয় অবস্থা।’

‘কত দূরে?’ ডাক্তার লিঙ্গে জানতে চাইল।

‘কত আর, এই একশো মাইল হবে।’

‘কতদিন আগে হয়েছিল?’

‘তিন দিন হল। আসতে আসতেই তিন দিন কেটে গেছে।’

‘অবস্থা কি খুবই খারাপ?’

‘বাকশক্তি হাড় সরে গেছে। পাজারর কয়েকটা হাড় তো নিশ্চয় ভেঙেছে। ডান হাতটাও ভাঙা। মুখটুকু বাদে সারা শরীর নখের আঁচড়ে ফলা ফলা, একেবারে হাড় অবধি পৌঁছে গেছে। নোহা উপায় নেই তাই কয়েকটা ক্ষত আমরাই সেলাই করে দিয়েছি আর শিরাগুলো সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছি।’

‘রাস্য—কস্মো সেরেছে।’ অবজ্ঞা ভরে বলে উঠল লিঙ্গে। ‘ক্ষতগুলো কোন জায়গার?’

‘পেটের।’

‘তার মানে যে অবস্থা করে রেখেছে, বুঝতেই পারছি।’

‘মোটেরেই না। সেলাই করার আগে পোকা মারা গুঁষ দিয়ে জায়গাগুলো পুরো পরিষ্কার করেছি। সাময়িকভাবে একটা জোড়াটা দিওয়া আর কি। লিনেন সুতো ছাড়া আর কিছুই তো ছিল না। তাও আমরা পরিষ্কার করে ঘুমে নিয়েছি।’

‘অঙ্কনে ধরে নিতে পার ওর মৃত্যু অবধারিত।’ ক্রুদ্ধ ডাক্তার তাস নাড়তে নাড়তে অভিমত প্রকাশ করে।

‘মোটেরেই না। ও মরবার লোক নয়। জানে, আমি ডাক্তার ঝুঁজতে এসেছি, যতক্ষণ না

তুমি গিয়ে পৌঁছোছো ঠিক বেঁচে থাকবে। নিজেকে ও মরতে দেবে না। আমি তো ওকে চিনি।’

‘ধর্মবিশ্বাস বনাম পচা-ধরা ক্ষত, অ্যা?’ ডাক্তার বিদ্রোহ করল। ‘যাকগে, আমি এখানে ডাক্তারি করতে আসি নি। আর একটা মরা মানুষকে দেখতে যাবার জন্যে একশো মাইল পায়ে হেঁটে যাবারও কোনো ইচ্ছে নেই।’

‘মদুঘটা মরে নি তাই যেতেও তোমার ইচ্ছে হবে।’

লিঙ্গে ঘাড় নাড়ে। ‘নাহে—বৃথাই তুমি এতদূর এসেছ। বরং রাষ্ট্রটা এখানে কাটিয়ে যাও।’

‘না। তোমাকে নিয়ে আর দশ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব।’

‘তুমি ভাবছ কী করে, যে আমি যাবই?’ লিঙ্গে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে।

উত্তরে ‘মম ভ’ যে বক্তৃতাটি খাড়ে সেটি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

‘তোমার যদি মনস্কির করতে সাত দিনও লাগে তবু তুমি না পৌঁছানো পর্যন্ত ও মরবে না। তাছাড়া ওর পাশে ওর বৌ আছে। চোখে তার এক ফোঁটা জল নেই, কোনো কান্নাকাতির বালাই নেই। তুমি না পৌঁছানো পর্যন্ত ওর বৌ ওকে ঠিক বাঁচিয়ে রাখবে। তারূণ ভাব ওদের মধ্যে। তাছাড়া ওর বৌয়ের মনের জোড়ও কিছুমাত্র কম নয়। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। লোকটা যদি দুর্বল হয়ে পড়ে ওর বৌ-ই তখন নিজের প্রাণটা পুরো দেবে ওর দেহে। ঠিক বাঁচিয়ে রাখবে। অবশ্য ও যে ভেঙে পড়বে না সে বিষয়ে আমি বাজি ধরতেও রাজি। তুমিও নিশ্চিত থাকতে পার। আমি তোমার চ্যালেঞ্জ করছি, তুমি পৌঁছে দেখবে ও ঠিক বেঁচে আছে।’ না যদি হয়, তুমি যা বাজি ধরবে ধর, তার তিনগুণ ওজনের সোনা আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব। তীরের ধারে আমার কুকুরের পাল অপেক্ষা করছে। দশ মিনিটের মধ্যে তোমার বেরিয়ে পড়া উচিত। যেতে তিন দিনের বেশি লাগবে না কারণ আমার আসার সময়েই বরফ কেটে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি তাহলে, কুকুরগুলোকে দেখা দরকার। দশ মিনিট বাদেই তুমি আসছ কিন্তু!’

‘মম ভ’ টুপি টেনে কান ঢাকা দিয়ে হাতে পশমি দস্তানা গলিয়ে বেরিয়ে গেল।

‘হতভাগা কোথাকার।’ বন্ধ দরজার দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেষ্টায়ে উঠল লিঙ্গে।

দুই

সেদিন রাতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার বেশ কিছুক্ষণ পরে ‘মম ভ’ আর লিঙ্গে তাদের ছাড়নি ফেলল। পঁচিশ মাইল পথ পিছনে ফেলে এসেছে তারা। ছাড়নিটা সাদাসিধে হলেও যথোপযুক্ত। বরফের ওপর আগুন জ্বলছে, তার পাশেই স্প্রুসের ডাল দিয়ে তৈরি মাদুরের একক শয্যার ওপর বিছানো হয়েছে ওদের লোমশ কম্বল দুটো। শয্যার পিছনে তেরহা করে বাটানো ক্যানভাসের টুকরোটা তাপ প্রতিফলিত করবে। ড’ কুকুরদের খেতে দিয়ে বরফ আর জ্বালানি কাঠ টুকরো করল। লিঙ্গে হাঁটু গেড়ে ঝাঁকতে বসেছিল, তুষারক্ষত হওয়ায় গাল দুটো খুব জ্বালা করছে। পেট ভরে খেয়ে তারা পাইপ ধরাল, তারপর আগুনের সামনে রোকাশিন জ্বতো শুকাতো শুকাতো গল্পগুজব হল ঘনিকটা। শোওয়া মাত্র গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল দুজনে। ক্রান্ত ও সুস্থ মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

সকালে উঠে দেখা গেল অস্বাভাবিক শৈত্যপ্রবাহে ছেদ পড়েছে। লিঙ্গের আদ্যজমতো

তাপমাত্রা এখন হিমাক্ষের পনরো ডিগ্রি নিচে, আরো কমে আসবে ঠান্ডা। ডা' চিন্তিত হয়ে পড়ে। আজই ওদের ক্যানিয়নে পৌঁছাবার কথা। দৃশ্চিন্তার কারণটা বুঝিয়ে বলে ডা'। বসন্ত কাল এসে গেলে বরফ গলে ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে জল বহিতে শুরু করবে। ক্যানিয়নের দেওয়ালগুলোর উচ্চতা শতসহস্র ফুট। আরোহণ হয়ত করা যাবে কিন্তু চলার গতি হবে মন্থর।

সৈদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীতিপ্রদ গিরি খাতের মধ্যে সুরক্ষিতভাবে ছাউনিটা ফেলার পর পাইপ ধরিয়ে বসে দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। বড় গরম পড়ে গেছে। দুজনেরই মতে তাপমাত্রা এখন শূন্যের ওপরে। গত ছমাসের মধ্যে এই প্রথম।

‘এত উত্তরের দিকে চিতাবাঘ দেখা যায় বলে কেউ কখনও শোনে নি।’ ডা' বলে চলে। ‘রবিকর ভাষায় জন্তুর নাম ‘কাউগার।’ আমি কিষ্টি আমাদের দেশে, ওরিগনের কারি প্রদেশে এরকম জন্তু অনেক শিকার করেছে। সে যাই হোক, যদি বাঘ বলের ধরে নিই, এত বড় বাঘ আমি জীবনে কখনও দেখি নি। একবারেই যক্ষিদের চেহারা। কী করে যে নিজেদের অঞ্চল ছেড়ে এতদূর এসে পড়ল, সেটাই একটা প্রশ্ন।’

লিভে কোনো মন্তব্য করল না। দুটো কাঠির মাথায় রাখা তার মোকাসিন থেকে বাশ্প উঠছে। জুতার দিকে কারোর নজর নেই। সেকারার জন্যে উত্তরও দেয় নি। কুকুরগুলো কুগুলি পাকিয়ে এক একটা লোমের ঢেলার মতো বরফে গুঁয়ে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ চটপট করে একটা জলন্ত কাঠ ফাটার শব্দে একতমশের গভীর নীরবতা মনে আরো স্পষ্ট হয়ে বরা পড়ল। ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসে উয়ের দিকে তাকাল লিভে। ডা-ও ঘাড় নেড়ে লিভের দিকে চাইল। দুজনেই কান বাড়ান করে শুনছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা অস্পষ্ট কলরব ক্রমশ প্রচণ্ড গর্জন হয়ে ওঠে। গর্জন ক্রমশই নিকটবর্তী হয়, ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে, পাছাদের শিখরে শিখরে, ক্যানিয়নের গহবরে গহবরে নেচে নেচে বেড়ায়। অরণভূমি এবং গিরিখাতের গায়ে ফটিলের মধ্যে গজানো স্বপ্নসংখ্যক পাইন গাছগুলোও তার দাপটে মাথা নত করে। ওরা বুঝতে পারে ভীতের মতো উষ্ম বাতাস বইছে, ঘূর্ণিঝড় উঠছে। অগ্নিকুণ্ড থেকে ফুলকির ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ছে। কুকুরগুলো ঘুম ভেঙে উঠে সামনের পায়ে ভরে রেখে বসেছে। হিম শীতল নাকগুলো আকাশের দিকে উঁচু করে হু-হু-শব্দে নেকড়ের মতো একটানা ডাক ছাড়ছে।

‘এবার চিনুক ধরতে হবে।’ ডা' বলল।

‘তার মানে নদীর পাশের রাস্তা তো?’

‘হ্যাঁ। পাছাড়ি পথে এক মাইল পেরোনা অনেক সহজ।’ প্রায় মিনিটখানেক লিভেকে ভালোমনে লক্ষ্য করার পর বাতাসের গর্জনের ওপর বলা চড়িয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ডা' বলল, ‘এ পর্যন্ত আমরা পনের ঘণ্টা হেঁটেছি।’ আবার একটু অপেক্ষা করে ডা' শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, ‘কী মনে হচ্ছে ডাক্তার, পারবে তো শেষপর্যন্ত?’

উত্তর হিসেবে লিভে তার পাইপের আগুন ঝেড়ে নিভিয়ে দিল। ভিজে মোকাসিনগুলো টেনে নিয়ে শুরু করে দিল পরতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুজনে মিলে প্রচণ্ড বাতাসের দাপট অগ্রাহ্য করে কুকুরদের তৈরি করে নিল লাগাম পরিণয়ে। ছাউনি গুটিয়ে লামশ কাম্পল আর রামার সাজসজ্জামগুলো স্টোডের পিঠে বাঁধা হল। অন্ধকারের মধ্যেই এবার যাত্রা শুরু করল ওরা। প্রায় এক সপ্তাহ আগে এই পথ দিয়েই ডা' এসেছে। সারারাত ধরে গর্জনে মুখরিত হয়ে রইল চিনুক। ক্রান্ত কুকুরগুলোকে যেমন তাকিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে তেমনই নিজেদের দেহের অবশ মাংস পেশিগুলোকেও সচল রাখার জন্য কম মেহনত

করতে হয় নি। আরো বারো ঘণ্টা হাঁটার পর প্রান্তরশ সারাবার জন্যে ওরা থামল। এক ন্যাড়াডে সাতাশ ঘণ্টা হেঁটেছে।

শেষ কয়েক পাটম বেকন দিয়ে ভাজা হরিণের মাংস গলধরু করণ করার পর ডা' বলল, ‘এবার এক ঘণ্টা ঘুম।’

সঙ্গীকে দুধটা ঘুমাবার সুযোগ দিল ডা'। নিজে সাহস করে চোখের পাতা এক করতে পারে নি। কোমল বরফের স্তরের ওপর আঙুলের আঁচড় কেটে সময় কাটিয়েছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বরফের স্তরের উচ্চতা ক্রমশ কমে আসছে। দুধটার মধ্যে তিন ইঞ্চি নিচে নেমে গেছে। বসন্ত বাতাসের কষ্টধর ছাপিয়ে অস্পষ্টভাবে অর্ধচন্দ্র বাহু থেকেই কানে আসছে অলক্ষ্যে প্রবাহিত জলস্রোতের শব্দ। অগুপ্তি জলধারা পুট লিটল পোকো নদী বরফের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

লিভের কাঁধে হাত রেখে তাকে জোরে জোরে ঝাঁকতে শুরু করল ডা'।

‘ডাক্তার! ও ডাক্তার! একটু চেষ্টা করে দেখ, ঠিক আরেকটু হাঁটতে পারবে, নিশ্চয় পারবে।’

নিদ্রায় ভারি চোখের পাতার তলয়ার ডাক্তারের ক্রান্ত কালো চোখ দুটো একবার সাড়া দিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

‘ডাক্তার! শুনছ—নশের আঁচড়ে একবারে ছিড়েইউড়ে পড়ে আছে রকি। আগেই তো বলেছি, কোনোরকমে আমি ওর পেট সেলাই করেছি, ডাক্তার—’ আবার ডাক্তারের চোখ দুটো বুঁজে আসতেই ঝাঁকানি দেয় ডা'। ‘শুনছ ডাক্তার, আরেকটু হাঁটতে পারবে কি? শুনতে পাচ্ছ, কী বলছি? আরেকটু হাঁটতে পারবে না?’

লাধি মেরে ক্রান্ত কুকুরগুলো ঘুম ভাঙানা মাত্র সবকটা দাঁত বিচিয়ে গরগর করে ওঠে। এখন ওরা মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। ঘণ্টা শিঘ্র দুমাইলের বেশি নয়। সুযোগ পেলেই কুকুরগুলো ভিজে তলয়ারের ওপর গুঁয়ে পড়ছে।

‘আর কুড়ি মাইল এগোলেই গিরিখাতে পৌঁছে যাব।’ ডা' উৎসাহ দেয়। ‘তারপর আর বরফের হাদ্গা নেই। আমরা পাড়ের ওপর উঠে আসব। ওখান থেকে দশ মাইল এগোলেই রকিদের শিরি। বলতে গেলে তো পৌঁছেই গেছি। রকির একটা ব্যবস্থা করে ফেরবার সময় তুমি নৌকায় চড়েই আসতে পারবে। একদিনে ফিরে আসবে।’

তুষারের ওপর পায়ে হাঁটা কিন্তু ক্রমশই দুর্ভাষ হয়ে উঠছে। জমাট নদী কিনারা থেকে খসে খসে পড়ছে বরফের চাঙড় আর যেখান থেকে খসে পড়ছে না, সেখানে জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। জলের মধ্যে ছপ ছপ করে পা ভিজিয়ে এগোতে হচ্ছে ওদের। কুকুল শব্দে বয়ে চলেছে লিটল পোকো। চারবারেই বরফের ওপর ফটল আর গর্ত দেখা দিচ্ছে। এখন এক একটা মাইল হাঁটা, সমতল দশ মাইল হাঁটার সমান।

‘স্নেজের ওপর চড়ে বস ডাক্তার। জিরিয়ে নাও একটু।’ ডা' আশ্বাস জানাল।

প্রত্যন্তরে কালো চোখের জলন্ত চাউনি তাকে আর খিঁচিয়ে বরাবর অনুবোধ করার সুযোগ দিল না।

দুপুর না হতেই আসন্ন অমঙ্গলের কথা স্পষ্ট টের পেল ওরা।

নদীর তুষারাবৃত বুকের ওপর দাঁড়িয়ে ওরা স্পষ্ট টের পাচ্ছে যে অন্তঃসলিলা বর জলস্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা তুষারের চাঙড়গুলো গুমগুম শব্দে আঘাত হানছে। শব্দাণ্ডিত কুকুরগুলো নাকে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। পাড়ের ওপর উঠে আসতে চাইছে

তারা।

‘বোঝা যাচ্ছে যে সামনেই নদীর বৃকের ওপর দিয়ে জল বইছে।’ ডা বোঝাতে শুরু করল। ‘একুনি কোথাও না কোথাও জলস্রোতে বাধা পড়বে, আর অমন একশো মিনিটে একশো ফিট লাফিয়ে উঠবে নদীর জল। ওপরে ওঠার একটা পথ পোলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাওয়া উচিত। এস এস, আর দেরি না।’ জেবে দেখ, এমনটিতে এই ইউকোনও সস্তার পর সস্তা ক্রমো জমাট বেঁধে পড়ে থাকে।’

ক্যানিয়নের এই অংশটা অত্যন্ত সংকীর্ণ। দুপাশের বিশাল দেওয়াল এত খাড়া যে ওপরে ওঠার কোনো উপায় নেই। বাধ্য হয়ে ওরা নদীর বুক ধরেই এগিয়ে চলল। তারপর সর্বসাই নেমে এল বিপর্যয়। অভিজাতী দলটির টিক মধ্যবর্তী অংশের পায়ের তলার জমাট বরফ সশব্দে বিস্ফোরিত হল। দড়িবাঁধা সারিবদ্ধ কুকুরদের মধ্যে মাঝখানের দুটো পাড়ে গেল বরফভাঙা গর্তে। কুকুর দুটোকে ভানিয়ে গেল জলধার তীব্র প্রবাহ আর সেই সঙ্গে দড়িতে টান পাড়ে সামনের কুকুরটাকেও পিছনে টেনে এনে গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। ডুবন্ত কুকুর তিনটের আকর্ষণ ক্রন্দনরত পিছনের কুকুর দুটোকেও ক্রমশ গর্তের দিকে টেনে আনল। ওরা দুজনে প্রাণপথ শক্তিতে স্নেজগাড়িকে চেপে ধরেছে কিন্তু আটকাতে পারছে না। ওদেরও টেনে নিয়ে চলেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেছে ব্যাপারটা। চকিতে ছুরির এক কোপে স্নেজ বাঁধা কুকুরটার দড়ি কেটে দিল ডা। মুহূর্তে মধ্যে কুকুরটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গর্তের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার দুজনে মিলে স্নেজটাকে টেনে এনে পাড়ের ওপর একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর চোখের সামনেই দেখল বরফের উপরিস্তর ভেঙে এক নাগাদে ধসে পড়ছে চাইটাই বরফ।

মাংস আর শোবার লোমওলা কম্বলগুলো শুধু গাঁটার বেঁধে নিয়ে স্নেজটাকে ওরা পরিত্যাগ করল। লিভে চায় নি ডা সবচেয়ে ভারি বোঝাটা বহন করুক, কিন্তু ডা—এর জেইই বজায় থাকল।

‘ভুলে যেও না ওখানে পৌঁছেই তোমাকে কাজে হাত লাগাতে হবে। চল, চল—’
দুপুর একটার সময় ওরা আরোহণ শুরু করে যখন ওপরে এসে উঠল তখন রাত আটটা। সমতল ভূমিতে পা দিয়েই দুজনে লাটিয়ে পড়ে জমির ওপর। একটা ঘণ্টা শুধু শুয়েই কাটিয়ে দিল। তারপর আগুন জ্বালান, কফি তৈরি হল, অচুর পরিকল্পনা মাংস গলনকরণ করল। অবশ্য প্রথমেই লিভে দুজনের বোঁচকা দুটো হাতে তুলে পরীক্ষা করে দেখেছে যে ডা—এরটা তার চেয়ে দু’গুণ ভারি।

‘সত্যি ভূমি লোহার মানস ভা’ ডাক্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ‘আমাকে বলছ? দূর-দূর-দাঁড়াও না রকির সঙ্গে আগে দেখা হোক। ষাঁট ইন্সপাত দিয়ে তৈরি—কিভাবে প্র্যান্সিয়াম বা সোনা, যা খুশি বলতে পার। আমি পর্বতারোহী কিন্তু তবু আমাকে ও হেঁসেবেলা কাবু করে দেয়। দেশে থাকতে কারি প্রদেশে যখন ডাল্লুক শিকারে যেতাম, আমার সঙ্গীদের ছুটিয়ে নাজেহাল করে ছেড়ে দিতাম। প্রথম যেদিন এখানে এসে রকির সঙ্গে ডাল্লুক শিকারে বেরোই, মাথায় বদমাইশি চাপল। অবলাম ওকে একটু শিকা দেখা যাক। হাতের শেকল ঢিলে দিয়ে কুকুরগুলোকে ছোঁতে শুরু করলাম। একটু পরে দেখি রকিও এসে হাজির হয়েছে। কত আর ছুঁতে এভাবে, আবার ঢিলে দিলিাম শেকল। এবার এক ঘণ্টা ছোঁটার পরেও দেখি যথারীতি আমার পিছনেই রয়েছে রকি। কোনো বনে গিয়ে বললাম, ‘এবার ভূমি বরং আমার সামনে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে চালা।’ রকি পথ দেখিয়ে এগাতে শুরু করে দিল সঙ্গে সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গ ছাড়ি নি, কিন্তু সত্যি

বলছি, ডাল্লুকের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত নাকানিচোবানি খাইয়েছিল।

‘রকিকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। শরীরে ওর ভয় বলে কোনো বস্তু নেই। গত বছর শরৎকালে একদিন ও আর আমি সন্দের মুখে শিবিরে ফিরছি, তখনো বরফ জমেত শুরু করে নি। ওর কাছে শুধু একটা কার্তুজ আছে আর আমার হাত একেবারেই ফাঁকা। এমন সময় কুকুরগুলো একটা মাদি গ্রিজলি ডাল্লুককে টাঁহর করল। ডাল্লুকটা ছোঁতে ছিল। মাত্র তিনশো পাউন্ডের মতো ওজন। কিন্তু ভূমি তো জানো, গ্রিজলিগুলো কীরকম হয়। ‘খবরদার, গুলি কর না।’ বন্দুক উচু করতাই রকিকে নিষেধ করলাম। ‘মাত্র একটাই গুলি আছে, তাছাড়া এত অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির করা যাবে না।’

‘ভূমি গাছে চড়ে বস।’ রকি বলল। গাছে আমি অবশ্য চড়ি নি কিন্তু ডাল্লুকটা যখন গুলি খেয়েও টলতে টলতে গজরাতে গজরাতে কুকুর পালের দিকে তাড়া করে এসেছিল, সত্যিই তখন জেবেছিলাম যে গাছে চড়ে বসে থাকলেও ভালো করতাম। সে এক কাণ্ড। অবশ্য আরো যোরােলা হয়ে উঠল ডাল্লুকটা যখন বীরট এক গাছের গুঁড়ির আড়ালে একটা গর্তে ঢুকে বসল। কুকুরগুলোর পক্ষে গুঁড়ির নিচের দিকে গিয়ে ডাল্লুকটাকে আক্রমণ করার কোনো উপায় ছিল না। এদিকে এপাশ থেকে ডাল্লুকের ওপর লাফিয়ে পড়া মাত্র এক এক ধাওয়া এক একটাকে স্বতম করে দিচ্ছে। চারদিকে শুধু যোপখাড়া, ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে, একটাও গুলি নেই—কিছু করার উপায় নেই।

‘তখন রকি কী করল জানো? গুঁড়ির নিচের দিকে গিয়ে আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে ছুরি চালাতে আরম্ভ করল। একবার, দুবার, তিন বার ছুরি বসাল কিন্তু শুধু চামড়া অবধি পৌঁছোচ্ছে ছুরিটা। ওদিকে একের পর এক কুকুরগুলো সাবাড় হয়ে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে উঠল রকি।

‘কুকুরগুলোকে এভাবে মরতে দেখা যা় না। এক লাফে গুঁড়ির ওপর চড়ে ডাল্লুকটার লেজ ধরে পিছনে দিকে ঝুঁকে পড়ল ও। টানের চোটে ডাল্লুক, কুকুর আর রকি সবাই মিলে গড়িয়ে পড়ল ঢালু পাড়ের ওপর থেকে বিশ ফুট নিচে নদীর জলে। সে কী চিংবাক, গজরাইনি আর আঁচড়াখাঁচড়ি। জলে পড়ে যে যেদিকে পারলো সাঁতরে উঠল। না, ডাল্লুকটাকে ধরতে পারে নি রকি, কিন্তু কুকুরগুলোর তো প্রাণ বাঁচল। এই হচ্ছে রকি। একবার যদি মনস্থির করে ফেলে কারোর সাধ্য নেই ওকে আটকাই।’
চলতি পথের পরবর্তী ছাড়নি তৈরি করার পর লিভে বসে বসে সুনতে লাগল রকির আহত হবার কাহিনী।

‘সেদিন আমাদের শিবির থেকে মাইল বানেক দূরে বনের মধ্যে গিয়েছিলাম। কুড়ুলের হাতল বানাবার জন্যে একটা বার্চ গাছের ডালের দরকার পড়েছিল।

কিরে আসছি, হঠাৎ কানে এল দারুণ হুঁগো—চোঁমাচি। এই জায়গাতেই আমার একটা ডাল্লুক ধরার ফাঁদ পেতেছিলাম। একটা পুরোনো খুঁড়ির মধ্যে কোনো শিকারী এই ফাঁদটা ফেলে গিয়েছিল। দেখতে পেয়ে রকিই পেতেছিল ফাঁদটাকে। সুনতে পেলাম পালা করে রকি আর তার ভাই হ্যারি একবার করে চিংবাক করছে, তারপরেই আবার হাসছে। মনে হল বনে কোনো খেলা চলছে। কিন্তু খেলাটা কী শুনলে মাথা তোমার গরম হয়ে যাবে। কারি প্রদেশেও অনেক আহাম্মুককে দেখেছি বীরভু দেবাবার জন্য যা নবু তাই করছে। কিন্তু রকির যা কাণ্ড বাঘিয়েছিল তার পাশে সে তো ছেলখেলা। ফাঁদে আটকা পড়ে একটা চিতাবাঘ হুম্বার করছে আর ওরা একটা সরু গাছের ডাল হাতে নিয়ে পালা করে জন্তুটার নাকের ওপর বাড়ি মারছে। কিন্তু শুধু এটুকু হলেও তো ভালো ছিল। কোপের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেই দেখি হ্যারি গাছের ডালটা দিয়ে বাড়ি মারার পর

ডালটা থেকে ছইকি ভেঙে নিয়ে অবশিষ্টটুকু গুঁজে দিল রকির হাতে। এবার বুঝতে পারছ? ওরা একবার করে বাড়ি মারছিল আর ডালটাকে ভেঙে ছোট করে দিচ্ছিল। সুনতে যতটা সোজা লাগছে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। চিতটা পিঠি কুঁজো করে, গুড়ি মেয়ে, পিছনে সরে, অত্যন্ত তৎপর ভঙ্গিতে আঘাত এড়াতে চাইছিল। তাছাড়া কখন যে সামনে ঝাঁপ মারবে তাও বোঝা দুশ্কার। আরো অদ্ভুত ব্যাপার চিতারির পিছনের একটা পা শুধু ফাঁসে আঁকা পড়েছিল। সে ফাঁসটাও বেশ ঢিলেই ছিল নিশ্চয়।

‘দুঃসাহসের খেলায় যেতে উঠেছিল দুজন। কাঠিটা একটু একটু করে ছোট হচ্ছে আর চিতাটাও ক্রমশই আরো ক্ষেপে উঠছে। দেখতে দেখতে কাঠিটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মাত্র চার ইঞ্চি পরিমাণ অবশিষ্ট রয়েছে—এবার রকির পালা। হ্যারি বলল, ‘এবার রাসে ফ্রান্স নাও, বুঝলে?’ রকি রাঙি হয় না, ‘কিন্তু কেন হবে?’ হ্যারি উত্তর দিল, ‘কারণ এবার তুমি মারার পর আমার জন্যে আর কাঠি বলে কিছু থাকবে না।’ রকি হাসতে হাসতে বলল, ‘তখন তোমাকেই হার স্বীকার করতে হবে। আমি কেন হার মেনে নেব?’ রকি চার ইঞ্চি কাঠি হাতে এগিয়ে গেল।

‘সত্যি ডাক্তার, জীবনে মনে আর কখনও এমন দৃশ্য না দেখতে হয়। বাঘটা পিছু হাটে, পিঠি কুঁজো করে গুত পেতেছিল। সোজা হলেই সামনে ছফ্ট জায়গা ধাবার মধ্যে পাবে। ওনিকে রকির কাঠি চার ইঞ্চি লম্বা। বাঘটা সতাইই বাগিয়ে পড়ল রকির ঘায়ে। এমন জাপটজাপট লেগে গেল যে গুলি চালালে দুজনই মরবে। হ্যারিই শেষ পর্যন্ত ছুরি চালিয়ে চিতারির স্টেট ফাঁসাল।’

‘আগে যদি জানতাম এইভাবে জেনেশুনে ও এই কাণ্ড করছে, কক্ষনো আসতাম না।’ সব শোনার পর ডাক্তার মন্তব্য করল।

‘ডাঃ বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বলে, ‘রকির বৌ-ও তাই বলেছিল। কীভাবে কী হয়েছে, এসব কথা বলতেই বারণ করে দিয়েছিল।’

‘লোকটা কি পাগল নাকি?’ বিপ্লিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল ডাক্তার।

‘ওরা সবাই পাগল। দুটো ভাই সারাক্ষণ এ-ওর পিছনে লেগে আছে। বালি বাহাদুরি দেখানো নিয়ে রেহারেবি। এই তো গত বছর শরতকালে, সেদিন দানুশ দুর্থে—খাল দিয়ে দুবার বেগে জল বয়ে যাচ্ছে, বরফের চাঙড় ভেঙ্গে চলেছে—দুভাই বাড়ি গরে নেমে পড়ল শাঁড়ার কাটাতে। এমন কোনো কাজ নেই যা ওরা করতে পারে না। রকির বৌও বাঘ যায় না। রকি বাঘ না করলে হেন কাজ নেই যা করতে পারে না। রকি কিন্তু ওর বৌকে মোটাটুকু সামলে সামলে রাখে। শিবিরের কোনো কাজ করতে দেয় না। সেইজন্যেই তো আমাকে আর আরেকজনকে ভালো মাইনে দিয়ে রেখেছে। অর্ধের ওদের অভাব নেই। দুজনে দুজনের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে। গত বছর শরতকালে ওরা প্রথম এই জায়গাটার এসেছিল। চারদিকে একবার তাকিয়েই রকি বলেছিল, ‘মানে হচ্ছে প্রচুর শিকার মিলবে।’ হ্যারিও সঙ্গে সঙ্গে রায় দিয়েছিল, ‘বেশ তো, এখানেই তাহলে শিবির বসানো যাক।’ আমি কিন্তু ভেবেছিলাম ওরা নিশ্চয় সোনার ঝাঁজে এসেছে। পরে দেখলাম সারা শীতকাল কেটে গেল, সোনা নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই।’

লিভের রাগ আরো বাড়ি, ‘মুর্খদের জন্যে আমারও কোনো মাথাব্যথা নেই। এখন ফিরতে পারলেই বাঁচতাম।’

‘না ডাক্তার, না—’ডাঃ ওকে আশ্বস্ত করতে চায়। ‘ফিরে যাবে কী করে, খাবার কোথায়? তাছাড়া কালই আমরা পৌঁছে যাব। শেষ নদীটা পেরোলেই তো ওদের কেবিন।’

সব কিছু বাদ দিলেও মনে রেখ, তুমি এখন তোমার খাটিতে নেই, চাইলেও আমি তোমাকে যেতে দেব না।’

ক্লান্ত হলেও লিভের কালো চোখ দুটো কলসে উঠে ডাক সতর্ক করে দিল। বাড়িবাড়ি করে ফেলেছে। ডাঃ হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরল।

‘আমারই অন্যান্য ডাক্তার। কিছু মনে কর না। অতগুলো কুকুর খোয়া গেল, মাথা কি আর ঠিক আছে?’

একদিন নয়, তিন তিন দিন পরে ওরা দুজনে পৌঁছতে পারল। পাহাড়ের মাথায় হঠাৎ তুষার ঝড়ে আটকে পড়েছিল। ক্লান্ত পায়ের ওরা এগিয়ে এল কেবিনের দিকে। গর্জনরত লিভল পোকো নদীর ধারে পেটমোটা কেবিনটা যেন খেবেড় বসে আছে। উজ্জ্বল সূর্যলোক থেকে অন্ধকার ঘরে পা দিয়ে লিভে প্রথমটা ঘরের বাসিন্দাদের তেমন ঠাহর করতে পারে নি। শুধু দুটি পুরুষ আর একটি নারীর অস্তিত্ব টের পেয়েছে। ওদের সম্বন্ধে অবশ্য তার কোনো আগ্রহ নেই। সোজা এগিয়ে গেল সে ব্যাকের দিকে, যেখানে আহত লোকটি শুয়ে আছে। চিত হয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। লিভে লম্বা করল লোকটির ভুরুগুলো পেনসিলের সরু রেখার মতো, মাথার খয়েরি চুলগুলো যেন রেশমের সুতো। পেশিবহুল সুদৃঢ় ঘাড়ের ওপর রোগা মুখটা বড় বেমানান লাগছে। তবু রুগ্ন মুখেও সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ অব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য লোপ পায় না।

‘ড্রেসিং করছে কী দিয়ে?’ মেয়েটিকে প্রশ্ন করে ডাক্তার।

‘করোনিভ সার্বলিমেট, রেগুলার সলিডশান।’ উত্তর দিল মেয়েটি।

ডাক্তারের চকিত দৃষ্টি এসে বিদ্ধ করল মেয়েটিকে। পর মুহূর্তেই সে আহত লোকটির দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছিল মেয়েটির। এবার জোর করে দম চেপে ধরেছে। লিভে এবার ঘরের পুরুষ বাসিন্দাদের দিকে তাকাল।

‘তোমরা এখন যেতে পার। কাঠ-টাক কাটাগে যাও।’

ওদের মধ্যে একজন অসন্তুষ্টভাবে গজগজ করে ওঠল।

‘কেসটা খুব সিরিয়াস। লিভে বুকিয়ে বলল, ‘আমি ওর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

‘আমি ওর ভাই।’ একটি লোক বলল।

মেয়েটি এবার অনুন্দের দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকাতেই ঘাড় নেড়ে অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে লোকটি দরজার দিকে পা বাড়াল।

‘আমাকেও যেতে হবে?’ বেঙ্কর ওপর থেকেই প্রশ্ন করল ডাঃ। এসেই গড়িয়ে পড়েছিল।

‘ইয়া—যাও এখন।’

কেবিন খালি না হওয়া অবধি ডাক্তার লোক দেখানো ভঙ্গিতে বুগীকে পরীক্ষা করার ভান করে গেল।

‘তাহলে এটা তোমার রেস স্ট্র্যাং?’ ঘর খালি হতে ডাক্তার বলল।

মেয়েটি ব্যাকের ওপর শায়িত লোকটির দিকে দৃষ্টি ফেরাল। যেন নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইছে যে এই লোকটাই রেস স্ট্র্যাং। নীরবতা ভঙ্গ না করেই এবার সে লিভের দিকে তাকাল।

‘কথা বলছ না যে?’

মেয়েটি অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ‘কী লাভ? তুমি তো জানো ওই রেস স্ট্র্যাং।’

'ধন্যবাদ। তবু তোমাকে মনে করিয়ে না দিয়ে পারছি না যে এই প্রথম আমার ওকে দেখার সৌভাগ্য হল। বস বস।' আঙুল করে টুলটা দেখিয়ে দিয়ে নিজে বেঞ্চটার ওপর বসে পড়ল। 'একবারে কাহিল হয়ে পড়েছি। ইউকন থেকে এখানে আসার কোনো বড়ো রাস্তা নেই।'

একটা পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে বড়ো আঙুল থেকে একটা কাঁটা বের করতে চেষ্টা করছে ডাক্তার।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করে মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'কী করবে এখন?'

'খাব দাব, বিশ্রাম নেব, তারপর ফিরে যাব।'

'না না, সেকথা নয়। বলছি ওর কী করবে?' অচৈতন্য লোকটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি বলল।

'করব আমার কী। কিছু না।'

বাক্সের কাছে এগিয়ে অসুস্থ লোকটির কোঁকড়া চুল ভর্তি মাথাটার ওপর আলতো করে হাত রাখল মেয়েটি।

'তার মানে তুমি ওকে খুন করতে চাও?' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল। 'তোমার কিছু না-করা মানেই খুন করা, কারণ চেষ্টা করলে তুমি ওকে বাঁচাতে পার।'

'তাই যদি মনে কর তো তাই।' একটু ভাবল লিভে।

তারপর নিষ্ঠুরভাবে হেসে তার চিন্তাটা খোলাসা করল, 'এই হতছাড়া দুনিয়াটায় সেই আদিমকাল থেকেই তো এই রীতীই প্রচলিত—কেউ বড় চুরি করলে লোকে তাকে মেরেই ফেলে।'

'তুমি কিন্তু অন্যায় কথা বলছো গ্র্যান্ট।' মেয়েটির শাস্ত কণ্ঠ। 'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি বেঞ্চায় বেরিয়ে এসেছি। কেউ আমায় বাধ্য করে নি। রেজ আমায় চুরিও করে নি। তুমিই আমাকে হারিয়েছ। অত্যন্ত খুশি মনে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আমি ওর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছি। আমার আগ্রহের কোনোই ঘাটতি ছিল না। বরং বলতে পার আমিই ওকে চুরি করেছি। আমরা একসঙ্গেই চলে এসেছি।'

'তা বলেছ ভালেই।' লিভে স্বীকার করল। 'তোমার চিন্তা করার স্বভাবটা আজও যায় নি দেখছি। তা ম্যাজ, রেককে তো তাহলে বেশ মশকিলে পড়তে হয়েছে বল।'

'যে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে, সে ঠিক তেমনি ভালোও বাদে—'

'ঠিক ততটা বেকাও হয় না।' মাঝখান থেকে বালি উঠল লিভে।

'তাহলে তুমি মানছো তো, যে, যা করেছি ভালেই করেছে?'

'দূর—' হার মানার ভঙ্গিতে বৃহত ঝুঁড়ল লিভে। 'বুদ্ধিমান মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার এই ব্যবসো। ছেলেরা সব ভুলে যায়, মিন্দের কথার জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে। তুমি যদি শুধু কথার জাল বুনেই রেককে পাকড়াও করে থাক, তাতেও অবাক হব না।'

এবার ম্যাজের নীল চোখের সরল দৃষ্টি আর আর সারা শরীর যৌবনের যে গর্বে টলনাক করে ওঠল সেটাই লিভের কথার উত্তর।

'না ম্যাজ, আমি কি ফিরিয়ে নিচ্ছি। তুমি নির্দোষ হলেও ওকে পাকড়াতে পারতে। শুধু ওকে কেন, যাকে ইচ্ছে তাকে। তোমার এই সৌন্দর্য, দেহের গড়ন আর বাঁধন—আমার তো না জানার কথা নয়। আমিও তো এই একই যন্ত্রে একদিন শোখাই হয়েছি। শুধু হয়েছি বলব কেন, আমার দুর্ভাগ্য যে এখানে আমার ইচ্ছেগুলো মেরে নি।'

অস্তির অধর্ষ কণ্ঠে বলে চলল লিভে। ঠিক সেই আগের মতো। ম্যাজ জানে লিভের

কথা মাত্রই স্বতঃস্ফূর্ত। লিভের শেষ কথাটার খেঁই ধরল ম্যাজ।

'মনে পড়ে গ্র্যান্ট—জেনেভা লেকের কথা?'

'না পড়ে উপায় কী! বলতে গেলে আমার খুশিগুলো তখন একটা অস্বাভাবিক মাত্রা পেয়েছিল।'

ম্যাজ ঘাড় নাড়ল। চোখগুলো তার জ্বলজ্বল করে ওঠল। 'পুরোনো দিনের বাতির বলেও তো একটা কথা আছে, মানো? প্লিজ গ্র্যান্ট, একটু মনে করে দেখ, সেই পুরোনো দিনগুলো...একটু মনে কর...একটু...আমাদের ভালোবাসার কথা...একজনের আরেকজনকে না হলে কী হত তখন?'

'তুমি কিন্তু অন্যায় সুযোগ নিচ্ছ।' লিভে একটু হেসে তারপর আবার বড়ো আঙুলটার ওপর আক্রমণ চালাল। কাঁটাটাকে টেনে বের করে ভুরু কঁচকে ঝুটিয়ে দেখল। শেষ পর্যন্ত রায় দিল লিভে, 'না ম্যাজ না। অত আদর্শবাদী হওয়া আমার ধাতেরই নেই।'

'তবু তুমি যে এতদূর পথ এত কষ্ট করে এসেছ সে তো একজন অপরচিত অসুস্থ মানুষেরই কথা শুনে।' ম্যাজ আশা হাড়ে না।

লিভের অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট প্রকাশ পায় তার কথার তীব্রতায়, 'তুমি ভাবটা কী? এই লোকটা আমারই বৌয়ের প্রেমিক জানলে তারপর আর এক পাও নড়তাম।'

'সে যাই হোক, এসে যখন পড়েছি আর ওর এই অবস্থা...কী করবে বল?'

'কিছু না। কেন করব? আমি কি ওর চাকর? ওই বরং আমার সর্বশ্রম লুণ্ঠ করেছে।'

ম্যাজ কথা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় রজারয় ধাক্কা পড়ল।

'গেট আউট! শুধু এক বালতি জল এনে দরজার বাইরে রেখে দাও।'

'তাহলে তুমি ওর চিকিৎসা...?' আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলতে শুধু করেছিল ম্যাজ।

'আজ্ঞে না। মুখ হাত পা ধোব।'

বিষেক বর্বরতার আঘাতে বিচলিত হয়ে পড়ল ম্যাজ। ঠোট দুটো তার শহু হয়ে উঠেছে।

'শোনো গ্র্যান্ট।' ম্যাজের কণ্ঠের এখন শাস্ত নীতল। আমি কিন্তু তাহলে ওর ভাইকে সব বলে দেব। স্ট্রায়ডের আমি চিনি। তুমি যদি পুরোনো দিনের কথা ভুলে যেতে পার, আমিও পারি। তুমি যদি কিছু না কর, হ্যারি তোমাকে খুন করবে। হ্যারি কেন, আমি বললে টম ড-ও তাই করবে।'

'তুমি তো আমাকে চেনো ম্যাজ, তারপরও ভয় দেখাচ্ছ? গভীর স্বরে ম্যাজকে ধমক লাগল লিভে। ব্যাসের সুবে যোগ করল, 'তাহাড়া আমাকে মারলেও তাতে তোমার রেজ স্ট্রায়ডের কী সুবিধে হবে বুঝতে পারছি না।'

ম্যাজের মুখ দিয়ে একটা চাপা গোঙানি বেরিয়ে আসে, ঠোটে ঠোটে চেপে ধরে। ম্যাজ দেখে লিভের চকিত দৃষ্টি ওর শিরশ্রণ লক্ষ্য করছে।

'না গ্র্যান্ট, আমি হিন্টরিয়ার রোগী নই।' ম্যাজ দ্রুতবেগে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বোঝাতে শুরু করে। দাঁতে দাঁতে জোকাহুকি লাগে। 'কোনোদিন কি দেখেছ আমায় এভাবে? কখনো না। হঠাৎ কি যে হল তোমার না, সামলে নিতে পারাবো ঠিকই। আসলে মাথার ঠিক নেই। রাগও হয়েছে প্রচণ্ড—তোমার ওপর। সেইসঙ্গে দুর্ভাবনা আর ভয়। ওকে আমি হারাতে চাই না। সত্যিই আমি ওকে ভালোবাসি, গ্র্যান্ট। ও আমার রাজা, আমার মনের মানুষ। একটার পর একটা ভয়ঙ্কর দিনগুলো ঠায় ওর পাশে বসে কেটে গেছে। ও গ্র্যান্ট, প্লিজ—প্লিজ দয়া কর—'

'স্বাম্যুর চাপ।' লিভের শুষ্ক মন্তব্য। 'সহ্য করার চেষ্টা কর, ঠিক হয়ে যাবে।' জেলে

হলে বলতাম একটা সিগারেট ধরাও।

অশ্লীল পদক্ষেপে ম্যাজ সরে এল। টুলের ওপর বসে লিন্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্যে আত্মপ্রাণ চেষ্টা করছে। ফ্যারারপ্রেস থেকে একটা বিকির ডাক শোনা যাচ্ছে। বাইরে নেকড়ে-কুকুর দুটো ঝগড়া বাধিয়েছে। লোমশ কম্পনের নিচে আহত মানুষটার বুকের ওঠাপড়া এখানে বসেই বেশ দেখা যাচ্ছে। ম্যাজ লক্ষ্য করে লিন্ডের ঠোটটোয় একটা অস্বাভাবিক হাসি ফুটে উঠছে।

‘বলত, ঠিক কতটা তুমি ওকে ভালোবাস?’ লিন্ডে প্রশ্ন করল। ম্যাজের বুকটা ঘন ঘন ওঠানোমা করে। লজ্জাহীন গর্বে ওর চোখ দুটো ঝলসে ওঠে। লিন্ডে ঘাড় নেড়ে জানাল সে তার উত্তর পেয়ে গেছে।

‘একটু সময় দাও আমাকে, কেমন?’ লিন্ডে বলল। ঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি বোলায়, কীভাবে শুভ্র করবে ঠিক করতে পারছে না। ‘একটা গম্প পড়েছিলাম অনেক দিন আগে।’ বাথহায়ে হারবার্ট শ—এর লেখা। ‘গম্পটা বলছি, শোনে। অপরূব সুন্দরী এক নারী আর এক সৌন্দর্যপ্রিয় সবল স্বাস্থ্যবান পুরুষের কাহিনী। জানি না, তার সঙ্গে তোমার রেক্স ওয়ানারের কতটা মিল। সে যাক, এ লোকটা ছিল চিত্রশিল্পী, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ও ভদ্রপুরুষ। কয়েক সপ্তাহ প্রেমের বন্যা বইয়ে, চুমুতে চুমুতে ভাসিয়ে, তারপর হঠাৎ একদিন উঠাও হয়ে গেল লোকটি। মেয়েটি ওকে যেভাবে ভালোবাসত, অনেকটা তোমারই মতো, মানে, আগে তুমি আমায় যেমন ভালোবাসতে আর কি। সেই জেনেভা লেকের মতো। দশ দশটা বছর মেয়েটা শুধু কেঁদে কেঁদেই কাটিয়ে দিল। কোথায় হারিয়ে গেল তার রূপ সৌন্দর্য। জানো তো, তীব্র দুঃস্বপ্নগ্রন্থায় অনেক মেয়েরই লাভণ্যের ধারা শুকিয়ে যায়। দশ বছর বাদে লোকটি যে কোনো কারণেই হোক তার দৃষ্টিশক্তি খুইয়ে, একদিন অসহায় অবস্থায় শিশুর মতো অন্যের হাত ধরে মেয়েটির কাছে ফিরে এল। ওর আর কিছু করার নেই। ছবি আঁকা জন্মের মতো মানে। মেয়েটিও খুব খুশি যে আর যাই হোক লোকটি তার মুখের চেহারা দেখতে পাবে না। শেষে মনে আছে নিশ্চয়, লোকটি ছিল সৌন্দর্যের পূজারী। কিছু না বুঝে সে নিশ্চিত মনেই মেয়েটিকে আবার আঁকড়ে ধরল। মেয়েটির সৌন্দর্যের কথা একটুও ভালো নি কিন্তু বারবার সে তার রূপের কথা বলত, অপেক্ষা করত তার আর দেবার কোনো উপায় নেই বলে।

‘একদিন শিল্পী তার প্রেমিকাকে বলল, জীবনে তার শেষ সাধ হচ্ছে পাঁচটা ছবি আঁকা। পাঁচটা মনুষ্য সৃষ্টি। যদি কোনোরকমে একবার দৃষ্টি ফিরে পেত, এই পাঁচটা ছবি একে নিশ্চিত মনে বলতে পারত, আর আমার কিছু চাই না। এরপর যেভাবেই হোক, মেয়েটি কোথেকে এক আশ্চর্য মলম যোগাড় করল। এই মলম চোখে লাগালে দৃষ্টি ফিরে পাবে অন্ধ শিল্পী।

‘এবার বুঝতে পারছ, মেয়েটি কী সমস্যায় পড়েছিল? দৃষ্টি পেলে শিল্পী যেমন ছবি পাঁচটা আঁকতে পারবে, তেমনই মেয়েটিকেও ত্যাগ করবে। সৌন্দর্য নিয়ে তার কারাবার। এই কুৎসিত মেয়েটিকে সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। পাঁচ দিন নিজের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত মলমটা সে শিল্পীর চোখে লাগাল।’

লিন্ডে কথা ধামিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ম্যাজের দিকে তাকাল। উজ্জ্বল কালো চোখের তারায় বিদ্যুৎসম প্রতিফলিত হচ্ছে যন্ত্রের মধ্যে প্রোলাল আলোগুলো।

‘আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তুমিও কি রেক্স স্ট্র্যাংগারকে ঠিক এতটাই ভালোবাস?’

‘যদি তাই হয়।’ ম্যাজও বেপরোয়া।

‘সত্যি কি তাই?’

‘হ্যাঁ।’

‘এতখানি স্বার্থভাগ্য করতে পারবে? ওকে ছাড়তে পারবে?’

অনিচ্ছুক ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল বেন, ‘হ্যাঁ।’

‘তুমি কি আমার সঙ্গে ফিরে যাবে?’

‘হ্যাঁ।’ এবার ম্যাজের কণ্ঠের ফিসফিসানির পর্যায়ে গিয়ে নামল। ‘আগে ভালো হয়ে যাক—তারপর।’

‘আমি কী বলছি বুঝেছ? সেই জেনেভা লেকের মতো। তুমি আবার আমার স্ত্রী হবে?’

ম্যাজ কঁকড়ে নুয়ে গেল তবু ঘাড় নেড়ে সাই দিল।

‘বেশ—ওই কথাই রইল।’ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল লিন্ডে, নিজের বোঁচকাটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঁধন বুলতে শুরু করল। ‘আমাকে সাহায্য করা দরকার। ওর ভাইকে ডাক। যে কজন আছে সবাইকেই ডাক। ফুটন্ত জল চাই—প্রচুর পরিমাণে। ব্যান্ডেজ এনেছি, কিন্তু তোমার কাছে কী আছে একবার দেখে নিই—’

ইতিমধ্যে সবাই ঘরে এসে ঢুকছে। ‘এই যে ড—লিন্ডে নির্দেশ দিল, ‘একটুনি একটা আগুন জালিয়ে জল ফোটাতে শুরু কর। আর তুমি—ওই টেবিলটাকে সরিয়ে জানলার সামনে রাখ। পরিষ্কার কর ওটাকে—ঘষে ঘষে ছাল ছাড়িয়ে ফেল একেবারে। যত পার পরিষ্কার কর—আর মিসেস স্ট্র্যাং, তুমি আমার পাশে থেকে সাহায্য কর। চাদর নেই নিশ্চই? যাক গে, সে বাবস্থা করে নেওয়া যাবে। তুমি তো ওর ভাই? শোনে, আমি এক অজ্ঞান করব, কিন্তু তারপর অ্যানাসথেসিয়ার ভারটা তোমাকেই নিতে হবে। এবার যা যা নির্দেশ নিচ্ছি, ভালো করে শুনো নাও। কিন্তু তার আগে—হ্যাঁ, ভালো কথা, নাড়ি দেখতে জানো তো?’

দুঃসাহসী এবং পারদর্শী শল্য চিকিৎসক হিসেবে চিরদিনই লিন্ডের খুব খ্যাতি। কিন্তু কী দূঃসাহসিকতায় কী পারদর্শিতায় এবার সে তার নিজের খ্যাতিকেও ভুলান করে দিয়েছে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ লড়াই চালিয়ে গেছে। এরকম বীভৎসভাবে ছিন্ন-ভিন্ন, হাড়গোড় ভাঙা একটা রোগী, এইভাবে এতদিন বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকা একটা মানুষকে নিয়ে ডাক্তার লিন্ডে কখনো কাজ করে নি। তবে সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে সে এ অবধি কোনোদিন এত স্বাস্থ্যবান একজন মৃত্যুপথযাত্রীকে চিকিৎসা করার সুযোগ পায় নি। লোকটার প্রাণ বাধের মতো, তা না হলে ডাক্তারের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেত। কী মানসিক, কী শারীরিক, স্বীকার করতেই হবে, যেন অজুত ওর বোঝার ক্ষমতা।

দিনের পর দিন কেটেছে যখন ও প্রচণ্ড জ্বরে ভুল বকেছে, দিনের পর দিন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেকেছে অতি ক্ষীণ হয়ে, নাড়ি খুঁজে পাওয়ায় দুশ্চর হয়েছিল। দিনের পর দিন জ্ঞান ফেরার পরেও মরা মানুষের মতো ক্রান্ত চোখ বুলে পড়ে থেকেছে, তীব্র যন্ত্রণায় সারা মূণ জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম নেবা দিয়েছে। লিন্ডেও অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সুযোগ, নিষ্ঠুর, দুঃসাহসী আর ভাগ্যবান লিন্ডে একের পর এক ঝুঁকি নিচ্ছে এবং জয়লাভও করছে। মানুষটাকে শুধু প্রাণে বাঁচিয়েই সন্তুষ্ট নয় সে। ঠিক সেই আগের সুস্থসবল সম্পূর্ণ মানুষটাকে ফিরিয়ে দেবে বলেই একের পর এক অত্যন্ত জটিল আর বিপজ্জনক অপস্রোচাচারের ঝুঁকি নিচ্ছে।

‘ও কি পশু হয়ে যাবে।’ ম্যাজ জিজ্ঞেস করল একদিন।

‘মোটের নী। আগের সেই জোয়ান মানুষটাকে ভেঙে কী কটাির মতো ও যে শুধু লেডচে লেডচে হাঁটবে, আর কথা কইবে, তাই নয়—ছুটবে, লাফাবে, নদী সাঁতারাবে, ভাঙুক

ধরবে, তার সঙ্গে লড়াই করবে—স্বাধীনতা আন্দোলন আত্মসম্মতি করে তুলবে। তাছাড়া আমি এখনই তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আগের মতোই মেয়েদের কিন্তু ও একইভাবে আকৃষ্ট করবে। সেটা কী তোমার খুব ভালো লাগবে? মনে রেখো কিন্তু, ওকে ছেড়ে তোমাকে চলে আসতে হচ্ছে।

‘বল, বলে যাও।’ দ্রুত নিশ্বাস পড়ে ম্যাজের। ‘ওকে তুমি পুরো সারিয়ে দাও। যেমনটি ছিল তেমনি।’

একদিক বার, স্ট্র্যাণ্ডের অবস্থা একটু ভালো বুললেই, লিভে ওকে অজ্ঞান করে সাহায্য করে সব কাণ্ড করছে। ছিন্নভিন্ন আঙুলগুলোকে নতুন করে কাটছে, জুড়েছে, সেলাই করছে। কদিন বাদে বা হাতটায় একটা খুঁত ধরা পড়ল। হাতটা খানিক দূর ঠিকই তুলতে পারছে কিন্তু তার বেশি আর নয়। সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করে লিভে। অনেককমভাবে জোড়াতালি দেওয়া হাতটাকে আবার সে কেটেকটে ফেলে। গোড়ার থেকে নতুন করে শুরু হয় অস্ত্রোপচার—খুঁতটা দূর করতেই হবে। এরপরেও স্ট্র্যাণ্ড যে প্রাণে বেঁচে গেল সে শুধু তার অসাধারণ জীবনীশক্তি আর স্বাস্থ্যের জন্যে।

‘তুমি ওকে খুন করে ফেলবে।’ রবিকর ভাই অভিযোগ করে একদিন। ‘আর কাটাছুটি কর না, অমনি থাকতে দাও। হাতটা আন্তরিক মরার চেয়ে পশু হয়ে বাঁচাও ভালো।’

লিভে তেলবেগুন খুলে উঠল। ‘বেরিয়ে যাও।—এরুনি বেরিয়ে যাও এখন থেকে। আমায় ব্যাধি করার করতে দাও, তারপর এসে বলো বেঁচেছে না মরছে। কেন বুঝতে পারছ না, এখন আমি যা বলব প্রাণ পেলেও তাই তোমাদের করতে হবে। তোমার ভাইয়ের এখন জীবনমরণ সমস্যা—মাথার ওপর ঝাড়া খুলছে। একটু এদিক ওদিক হলেই—ব্যাঙ্গ! এবার বুঝতে পারছ? এসব কথা ওর কানে পড়ে। একটু দৃষ্টিভ্রান্ত দেখা দিলেও সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। যাও এখন বাইরে নিয়ে যাখা ঠাণ্ডা করে মুখে হাসি নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এস। ঠিক বেঁচে যাবে। দুজনে মিলে ওই আশ্রয়স্থল ক করার আগে ঠিক যেমনটি ছিল, আবার তেমনি দেখতে পাবে। যাও যাও, বেরোও বলছি।’

হারি মুখি পাকিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ম্যাজের দিকে তাকাল পরামর্শ নিতে।

‘প্লিজ—যাও এখন।’ অনুরোধ করল ম্যাজ। ‘ঠিকই বলেছে ডাক্তার। সত্যি কথাই বলেছে।’

এরপর একদিন স্ট্র্যাণ্ডের অবস্থা একটু ভালোর দিকে গেল ওর ভাই বলল, ‘সত্যি ডাক্তার, তুমি অসাধ্য সাধন করছ। কিন্তু কী বিশী ব্যাপার বলত, তোমার নামটাই জিজ্ঞেস করা হয় নি।’

‘নাম নিয়ে কী ধুয়ে খাবে! নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও। যাও যাও, বিরক্ত কর না এখন।’

‘ভান হাতটা কিন্তু ঠিকমতো সারছে না। চামড়া ফেটে আবার পুঁজ বেরোচ্ছে, দগদগে হয়ে উঠছে ঘা-টা।’

‘নেক্রোসিস।’ লিভে মন্তব্য করল।

‘ব্যাঙ্গ—এইবার বতম।’ হাফাকার করে উঠল হারি।

‘দুপ কর।’ ধমক লাগাল লিভে। ‘বেরিয়ে যাও। শিগগির ডা’ আর বিলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়। জ্বাল খরগোশ ধরে আনো দেখি—বেশ ম্যাটোসেটা দেখে আনবে। ফাঁদ পেতে ধরবে। চারদিকে ফাঁদ পেতে দাও।’

‘কটা চাই?’ হারি জিজ্ঞেস করল।

‘চল্লিশ—চারশো—চার হাজার—যত পার নিয়ে এস। মিসেস স্ট্র্যাণ্ড—আমাকে একটু সাহায্য করা দরকার। হাতটা আরেকবার কেটে ব্যান্ডেজ করব। কই—তোমরা গেলে না এখনো!’

লিভে নিপুণ হাতে দ্বিরিতে ছুরি চালান। হাড় পচ ধরছে। ঠেঁচ ঠেঁচে সরিয়ে দিচ্ছে পাচ মাংসগুলো। কতদূর পাচ লেগেছে দেখে দিচ্ছে লিভে।

‘এরকম হবার কথা ছিল না কিন্তু।’ ম্যাজকে বলল লিভে। ‘আসলে শরীরের বিভিন্ন অঞ্চলে লড়াই চালাতে হচ্ছে বলে ওর প্রাণশক্তি সুযোগ পায় নি ক্ষত নিরাময় করার। আগেই দেখেছিলাম, তবু অপেক্ষা করেছি সেসে যায় কিনা দেখতে। নাহ—হাড়টাকে বাদ দিতেই হবে। হাড়টা বাদ দিলে ও প্রাণে মরবে না কিন্তু খরগোশের হাড়টা জুড়তে পারলে আগের মতোই আবার সব কিছু করতে পারবে।’

শেষে শেষে খরগোশের মধ্যে থেকে দেখে শুনে বাছাই করে বার বার পরীক্ষা করে, একটা পছন্দ করল লিভে। ক্লোরোফর্মের শেষ ফোঁটাও নিঃশেষ করে শেষ পর্যন্ত বোন—গ্র্যাফটিং হল—কাঁচা হাড়ের সঙ্গে কাঁচা হাড়, জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত প্রাণী—অনুদ অনুদ্যায় ব্যান্ডেজের ঝামেলা এক এক হয়ে পড়ে রয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া একটা নিখুঁত বাহর জন্ম দিচ্ছে।

অধীর আগ্রহে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছে সবাই। ফলাফল এখনো জানা যায় নি। এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার লিভে আর ম্যাজের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। লিভে যেমন সদয় নয় তেমনি ম্যাজও বিরোধী নয়।

‘কী বিশী ব্যাপার বলত।’ লিভে একদিন ম্যাজকে বলল। ‘তবু আইন যা আইন। তুমি ডিভোর্স না দেওয়া অবধি আমরা আবার বিয়ে করতে পারব না। তোমার কী ইচ্ছে? জেনেটা লেকে যাবে?’

‘তুমি যা বল।’

আরেক দিন লিভে ম্যাজকে বলেছে, ‘আচ্ছা, ওই লোকটার মধ্যে তুমি এমন কী দেখেছিলে বলত? জানি, ওর অনেক পয়সা ছিল। কিন্তু আমরাও তো মোটামুটি স্বাচ্ছন্দেই দিন কাটিছিলাম। তখন তো বছরে প্রায় গড়ে চল্লিশ হাজার করে পেতাম ডাক্তারি করে। রাজপ্রাসাদ আর শ্রম নৌকো বাদ দিলে আর কিছুই অভাব ছিল না তোমার।’

‘তোমার কথার মধ্যেই বোধহয় তোমার প্রশ্নের উত্তরও বুঝিয়ে আছে। মনে হয় তুমি তোমার ডাক্তারি নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত ছিলে, সময় দিতে পার নি একটুও। আমাকে তুমি ভুলে গিয়েছিল তখন।’

‘তাই নাকি।’ তিরিকভাবে বলল লিভে। ‘কিন্তু তোমার রোগও তো দেখছি চিতাবাঘ আর ছোট ছোট কাঠি নিয়ে খোঁচা দেওয়ার খেলায় ঠিক তেমনি ব্যস্ত।’

লিভে ক্রমাগত খুঁচিয়ে চলে ম্যাজকে। রোগের প্রতি তার এই প্রবল আকর্ষণের কারণ কী বুঝিয়ে বলতেই হবে।

‘এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।’ বারবার এই একই কথা বলেছে ম্যাজ। শেষ পর্যন্ত একদিন রোগে যায়, ‘কেন প্রেমে পড়েছে কেউ বোঝাতে পারে না। আমি তো নয়ই। আমি শুধু বুঝতে পেরেছি যে প্রেমে পড়েছি। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার, রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই। সবাই জানে গরুর লেজটা নিচের দিকে ঝোলে। কেউ যদি প্রশ্ন করে, লেজটা কেন নিচের দিকেই শুধু ঝোলে? উত্তর দেওয়া যাবে না, তবু লেজটা কিন্তু সেই নিচের দিকেই ঝুলে থাকবে।’

‘তুমি এত চালাক না!’ বিরক্তিতে লিন্ডের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

‘তা এত জ্যাগা থাকতে ক্লনডাইকে এসে হাজির হয়েছিল কেন?’ একদিন প্রশ্ন করল ম্যাজ।

‘ঢাকার গরম। বৌ নেই যে খরচ করব। একটু বিশ্রাম চাইছিলাম। বোধহয় খাটাখাটনি বেশি হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে কলোরাডোতে সেলাম কিন্তু রেহাই পাই নি—টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসছে, এমনকি বোগীরাও শরীরে এসে হাজির হচ্ছে। সিয়টলে গেলাম। সেখানেও একই ব্যাপার। র্যানসাম তার বৌকে পাঠিয়ে দিল স্পেশাল ট্রেনে চাপিয়ে। এড়াবার কোনো উপায় রইল না। অপারেশন সার্থক—স্থানীয় সংবাদপত্রে ববর—বাঁকটুকু অনুমান করে নাও। গা ঢাকা দিতে পালিয়ে এলাম ক্লনডাইক। টম ভর সঙ্গে যখন দেখা হল তখন কেবিনে বসে তাস খেলছিলাম।’

এগুপের একদিন সকালে স্ট্র্যাঙকে বাঁটসডক ঘরের বাইরে এনে রোদ্দুরে শোয়ানো হল।

‘এবার তাহলে ওকে বলি?’ লিন্ডেকে জিজ্ঞেস করল ম্যাজ।

‘না। এখনো সময় হয় নি।’

আরো কয়েকদিন কাটল। স্ট্র্যাঙ এখন খাটের ধারে বা খুলিয়ে বসতে পারছে। দুপাশে দুজননের কাঁধে রথ রেখে টলমল করে হাঁটছে।

‘এবার তাহলে বলে ফেলি?’ আবার জিজ্ঞেস করে ম্যাজ।

‘না। আমি কোনো আর্থ খেঁড়া কাজ করতে চাই না। চাই না আবার নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দিক। এখনো ওর বা হাতে একটু ত্রুটি রয়ে গেছে। ব্যাপারটা সামান্য হলেও আমি ছাড়তে রাজি নেই। ঠিক ঈশ্বর যেমনভাবে ওকে সৃষ্টি করেছিল, আমি আবার নতুন করে তাই করব। কালকেই আমি হাটটার একটা ব্যবস্থা করব। আবার অবশ্য ওকে কদিন বিছানায় শুয়েই কাটাতে হবে। জানি, একটুও ক্লোরোফর্ম নেই কিন্তু আমি নিবুপায়। ওকে দীর্ঘত দিনে টিপে সহ্য করতে হবে। পারবে, ঠিক পারবে। ডজনখানেক মানুষের সহ্য ক্ষমতা আছে ওর একার।’

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ে। দূরে পূর্বদিকে পাহাড়ের চূড়াগুলো বাদ দিলে আর কোথাও এখন তুষারের চিহ্ন নেই। দিনটা ক্রমশ বড় হতে হতে শেষে আর রাত বলে কিছু থাকে না। উভয় দিকে মাঝরাত্তর ববরকার কয়েক মিনিটের জন্যে শুধু নিঃশব্দপারে সূর্যদেব মুখ লুকোয়। লিন্ডে এখনো স্ট্র্যাঙকে রেহাই দেয় নি। ওর হাঁটচাল, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির ওপর নজর রাখছে। বারবার জামা খুলিয়ে হাজার বার শুধু মাংসপেশিগুলোর কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করছে। ম্যাসজের তো আর অভ্যস্ত নেই। লিন্ডেও স্বীকার করে যে ম্যাসজ করতে কজনে টম ড’, বিল আর হ্যারি প্রত্যন্তেই এখন নাগপাালের কর্তব্য মতো দক্ষতা অর্জন করেছে। তবু লিন্ডের মন ভরে না। স্ট্র্যাঙকে দিয়ে সে সবরকম পরিশ্রমের কাজ করায়। কোথাও যদি গোপন দুর্বলতা থাকে টের পেয়ে যাবে। লিন্ডে আবার এক সপ্তাহ জন্মে বিছানায় শুইয়ে ফেলল স্ট্র্যাঙকে। পায়ের দণ্ডার ফের কাটাটুকু শুণু করল কয়েকটা ছোট শিরা নতুন করে জুড়ুবে বলে। কড়িকর দণ্ডার মতো ছোট এক টুকরো হাড়কে ঘষে ঘষে সমান করে শেষ পর্যন্ত চামড়া টেনে স্ট্রিচ করে জুড়ু দিল।

‘এবার বলতে দাও?’ ম্যাজ অনুরোধ করল।

‘উই—সময় হলে আমিহি তোমায় বলতে বলব।’

জুলাই পার হয়ে গেল, আগস্টও শেষ হব হব করছে, এমনি সময় লিন্ডে একদিন জ্বকুম করল, আজ স্ট্র্যাঙকে হরিণ শিকারে বেরোতে হবে। লিন্ডে স্ট্র্যাঙের শিঁখু নিল।

সজাগ নজর রাখছে। ছিপছিপে গড়ন স্ট্র্যাঙের, মাংসপেশিতে বাঘের শক্তি। লিন্ডে কখনো এমন ভাবে কোনো মানুষকে হাঁটতে দেখে নি। এত অনায়াস তার ভঙ্গি, দেহের প্রতিটি অঙ্গ যেন মদত যোগাচ্ছে, কাঁধের মাংসপেশি পর্যন্ত যেন সহযোগিতা করছে। প্রয়াসের কোনো বালাই নেই তাই তার লম্বা পায়ের গতি এত অপূর্ণ। বড় চলনাময় ওর হাঁটার গতি। দেখে একটুও বোকা যায় না যে ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে যাওয়া মূর্খতা। টম ড’ও এই অভিযোগ করেছিল। যেমে নেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে লিন্ডে ওর পিছনে পিছনে চলেছে। সমতলভূমি পেলেই খানিকটা করে ছুটে গিয়ে ওর নাগাল পেতে হচ্ছে। দশ মাইল পার হতেই লিন্ডে ওকে থামতে বলে। সটান খাশেস ওপর শুয়ে পড়ে।

‘বাস্! বাস—আর নয়। তোমার সঙ্গে ছোট্টার সাধ্য নেই আমার।’ মুখ মোছে লিন্ডে। গরমে যেমে লাল হয়ে গেছে। স্ট্র্যাঙ একটা গাছের গুঁড়ির ওপর চড়ে বসে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসে আর প্রকৃতিপ্রেমীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারদ্বারের শোভা উপভোগ করে।

‘কোথাও কোনো খেঁচকা, ব্যাথা, জ্বালা বা জ্বালার ভাব টের পাছ কি?’ লিন্ডে জানতে চাইল।

স্ট্র্যাঙ কৌকড়া হুলভর্তি মাথাটা নেড়ে, পা ছড়িয়ে, শরীরটা টান করে বসল। ওর দেহের তল্লীতে তল্লীতে প্রাণপ্রাচুর্য আর মুগ্ধ গান বেজে ওঠে।

‘তোমার আর ভাবনা নেই, প্রথম দুইকটা বছর শীতকালে হয়তো পুরনো ক্ষতগুলোয় একটু ব্যথা হবে, কিন্তু সেটা থাকবে না। এমনও হতে পারে যে কোনো ব্যাথাই তুমি টের পাবে না।’

‘সত্যি ডাক্তার, অসাধ্য সাধন করেছে তুমি। কী করে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। তোমার নামটা অবধি জানা হয় নি।’

‘নামে কী যায় আসে। তোমাকে যে সারিয়ে তুলেছি সেটাই বড় কথা।’

‘কিন্তু তোমার যে বেশ নাম—ডাক আছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। হয়ত তোমার নামটাও আমার পরিচিত।’

‘হবে হয়ত?’ লিন্ডে কথাটা এড়িয়ে গেল। ‘কাজের কথায় আসা যাক। এবার তোমার শেষ পরীক্ষা। এটাকে যদি সফল হও, ব্যাস—আমার কাজ শেষ। শুনেছি এই ঝড়ির মাঝার দিক দিয়ে বিগ ওয়াইন্ডি নদীর একটি শাখা নদী বয়ে যাচ্ছে। ভর মুখে শুনেছি, গত বছর তুমি এই নদীর মাঝের ফালি অবধি গিয়ে ফিরে এসেছিলে। মাত্র তিন দিনে। ড’ বলছিল তুমি নাকি ওর প্রাণ বার করে ছেড়ে দিয়েছিলে। আজকের রাতটা তুমি এখানেই থাকবে। ভাউনি ফেলার সাজসজ্জা সমেত আমি এখনি ডাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আগের বছরের মতো তিন দিনের মধ্যে তোমাকে ওই অবধি গিয়ে ফিরে আসতে হবে। তবে বুঝবে একেবারে শরীর সেরেছে।’

‘এক ঘটনার মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে।’ লিন্ডে হুকুম করল ম্যাজকে। ‘আমি যাচ্ছি নৌকোর ব্যবস্থা করতে। বিল হরিণ মারতে গেছে কাজেই তিন দিনের আগে ফিরছে না। আজই আমার আমার কেবিনে পৌঁছে যাব। সপ্তাহখানেক লাগবে ডসন্ পৌঁছাতে।’

‘আমি আশা করেছিলাম...’ কথাটা শেষ করল ম্যাজ।

‘আশা করেছিলে আমি পারিশ্রমিকটা চাইব, না?’

‘চুক্তি যা চুক্তি—মানতেই হবে। তবে এরকম বিপরীভাবে ব্যাপারটা না ঘটলেও চলত। তুমি কিন্তু অন্যায্য করছ। তিন দিনের জন্যে ওকে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দিলে যে

শেষ কথা বলায়ও সুযোগ দিলে না।

‘চিঠি লিখে রেখে যাও।’

‘কোনো কথাই লিখতে আমি বাদ দেব না।’

‘হ্যাঁ তাই লিখো, না হলে সেটা আমাদের তিনজনের প্রতিই অন্যায় করা হবে।’

নৌকার ব্যবস্থা করে ফিরে এসে লিভে দেখল, ম্যাক্স জিনিসপত্র বেঁধে ফেলেছে, চিঠি লেখার কাজও শেষ।

‘চিঠিটা একবার পড়তে পারি? যদি তুমি চাও, তবেই অবশ্য।’

ক্ষণিকের জন্যে ইতস্তত করে ম্যাক্স চিঠিটা বাড়িয়ে দিল।

‘একবারে সাজসজ্জি লিখেছি।’ চিঠিটা শেষ করে মন্তব্য করল লিভে। ‘এবার চল তাহলে।’

ম্যাক্সের বৈ্যাকটা নদীর তীর অবধি বয়ে নিয়ে এল লিভে। হাঁটু গেড়ে বসে এক হাত দিয়ে নৌকাটাকে স্থির করে, অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল ম্যাক্সের দিকে। নৌকায় উঠতে সুবিধে হবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যাক্সের মুখের দিকে তাকাল লিভে। আশ্চর্য—অস্থিরতার কোনো লক্ষ্যণ নেই। একটুও ভেঙে পড়ে নি ম্যাক্স। লিভের হাত ধরে নৌকায় পা দেবে বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

‘দাঁড়া!’ লিভে বলল। ‘এক সেকেন্ড দাঁড়াও। সেই যে তোমাকে যাদু মলমের গম্পটা বলেছিলাম মনে আছে তো? গম্পের শেষটা বলা হয় নি। শিল্পীর চোখে ওষুধ লাগিয়ে মেয়েটি বিদায় নিতে যাবে, সহসা তার আয়নার চোখ পড়ে গেল। কী আশ্চর্য—সে তার আগের রূপ ফিরে পেয়েছে। শিল্পী চোখ মেলেই তার সুন্দরী প্রেমসীকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরল।’

অধীর উত্তেজনা কোনোক্রমে প্রশমিত করে নীরবে অপেক্ষা করে ম্যাক্স। লিভের মুখের শেষ কথাটা জানবার জন্যে অধীর আগ্রহ অনুভব করছে। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে রিশ্ময়ের প্রথম অভ্যাস।

‘সত্যিই তুমি সুন্দরী ম্যাক্স।’ একটু থেমে লিভে এবার শুশু কণ্ঠে যোগ করল, ‘বাকিটুকু আর বলায় প্রয়োজন আছে কি? রেক্স স্ট্র্যাভকে আর বেশিদিন বিরহজ্বালা সহ্য করতে হবে না। শুভ বাই—’

‘গ্র্যান্ট...’ অশ্রুট কণ্ঠে ডাকল ম্যাক্স। ডাকের মধ্যেই তার অন্তরের সব কথা লুকিয়ে আছে, কথা বলে বোঝাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

কুৎসিতভাবে হাসে লিভে। ‘আমি তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে লোকটা আমি ততটা খারাপ নই। শুধু আগুন—জ্বলন্ত আগুন।’

‘গ্র্যান্ট—’

নৌকায় পা দিয়ে লিভে তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিল। উত্তেজনায় কাঁপছে হাতটা। ‘গুড বাই—’

ম্যাক্স তার দুহাতে জড়িয়ে ধল লিভের হাতটা।

‘গ্র্যান্ট—আমার গ্র্যান্ট—’ ম্যাক্সের কণ্ঠে গুল্লন ওঠে। মুখ নিচু করে হাতের ওপর চুমু খায়।

এক ঘটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পাড়ের ওপর ঠেলা মেরে নৌকা ছেড়ে দিল লিভে। জলের মধ্যে দাঁড় নামিয়ে নৌকা বাইতে শুভু করে দিল। সামনেই দেখা যাচ্ছে নদীর শান্ত জলপ্রোত একটা বাধার সম্মুখীন হয়ে প্রবল উজ্জ্বাসে সান্না ফেনার মেঘ উড়িয়েছে।

এক টুকরো মাংস

পাড়রুটির শেষ টুকরোটা দিয়ে প্লেট থেকে ময়দার তরকারির অবশিষ্টটুকু চেটেপুছে খুলে নিল টম কিং। টুকরোটাকে মুখে পুরে ধীরে সুস্থে চিন্তামগ্নভাবে চেবাতে শুরু করল। হাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে ওঠার পরেও মনে হচ্ছে বিদেটা মেটে নি। তবু তো বাড়ির মধ্যে ও একাই আজ খেয়েছে। ছেলে দুটোকে আগেভাগে ঘুম পাড়িয়ে পাশের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ওরা খেতে পায় নি বলে চোঁচামেচি না করে। টমের বউ মুখে কিছু টেকায় নি। চেয়ারে বসে মায়াভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। শুমিক ঘরের মেয়ে টেকার বো। শুকনো রোগা চেহারা হলেও মুখ থেকে লাবণ্যটুকু এখনো পুরো মুখে যায় নি। তরকারির জন্যে ময়দাটা সে প্রহরবেশীর কাছ থেকে ধার করে এনেছিল। শেষ পুঁজি দুটো আধ পেনি খরচ হয়েছে পাউরুটি কিনতে।

জানালার পাশে রাখা একটা অতি রুগ্ন চেয়ারের ওপর বসামাত্র চেয়ারটা টমের ভারের প্রতিবাদে ককিয়ে উঠল। বেশিনের মতো অভ্যাসবশত পাইপটা মুখে গুঁজে কোটের পাশ পকেটে হাত পুরে দিল টম। পকেটে তামাক না পেয়ে তার ঈশ ফিরল। নিজের ভুলো মনের কথা ভেবে ভুরু কঁচকে পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে নিল। ওর নড়াচড়ার ব্যাপারটাই কেমন মন্থর। যেন নিজের পেশির ভারে নিজেই কাবু। পাথরের চাঁইয়ের মতো বিশাল মেহের অধিকারী টম কিং সস্তা কাপড়ের ঢিলেঢোলা প্যান্ট শার্টগুলো বহুদিনের পুরোনো। জুতার তলায় অনেক দিন আগেই সুকতলা মারা হয়েছে, ওপরের চামড়াও ছিঁড় ছিঁড় করছে। দু শিলিং দামের সূতির শার্টের কালারটা ফাটা। সারা জামায় রঙের দাগ। কাচলেও উঠবে না।

কিন্তু এ সবই গৌণ। টম কিং-এর সত্যিকার পরিচয় পেতে হলে ওর মুখের দিকে তাকতে হবে। তাহলেই নিঃসন্দেহে বলা যাবে ও একজন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। চারটোকো দড়ি বাঁধা রিঙ্গেয় মধ্যে জীবনের বেশ কিছু বছর সে পার করেছে আর তারই দৌলতে তার মুখখানা আজ যোদ্ধা পশুর মতোই চিহ্নিত। লুটিক, মুখখানা দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা। তার ওপর আবার পরিশ্রমের করে দাড়ি কাপনের জন্যে মুখের প্রতিটি রেখা যেন আরো কুৎসিতভাবে আত্মপ্রচার করছে। মুখের মধ্যে একটা গভীর ক্ষতচিহ্নের মতো কদাকার ঠোট দুটো থেকে যেন মাত্রাতিরিক্ত রক্তচাপ ঝরে পড়ছে। ভারী ভারী চোয়াল দুটোয় পানাবিক একটা আক্রেণ জন্মে আছে। লোমশ ভুরুর তলায় অলস মন্থর ভাবাবেগহীন দুটো চোখ। নিছক পশু হিসেবে শনাক্ত করার পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক ওর অনুভূতিশূন্য চোখ দুটো। নিস্ভাতুর চোখ দুটো যেন সিংহের মতো—শিকারি জন্তুর যেমন হয়। কপালের দিকটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে। কদমইট ঢুলের তলায় এবড়ো খেঁকড়া মাথাটা পাক্কা বদমাশের মতো দেখায়। নাকটা দুবার ভেঙছে আর অসংখ্য আঘাতে যথেষ্ট একটা আকার নিয়েছে। কান দুটো আকারে দ্বিগুণ হয়ে ঠিক ফুলকপির মতো ফুলে আছে। এত অলঙ্কারের পর আবার সদ্যকামানো মুখ বাড়ির অভ্যাস একটা নীলচে কালো ছোপ ফেলেছে।

মেটের ওপর অন্ধকার গলিতে বা নির্জন জায়গায় হঠাৎ ওর মুখোমুখি হলে যে কেউ ভয় পেতে পারবে। কিন্তু তবু টম কিং অপরাধী নয়। আজ অবধি কোনো অপরাধই সে

করে নি। দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত মামুলি কগড়াকাটির কথা বাদ দিলে কারোর কোনো অনিশ্চয় করে নি। গায়ে পড়ে ঝগড়া করা অবধি তার স্বভাবে নেই। ও পেশাদার ব্যায়াম। কাজেই গুর চরিত্রের পাশবিক অংশটুকু পেশাদার লড়াইয়ের মঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রিক্সের বাইরে টম কিং সাদাসিধে মানুষ, কারোর সাথে পাঁচে নেই। অশ্প বয়সে যখন প্রচুর রোজগার করেছে, নিজের ভালোমন্দ বিচার না করেই পাঁচ জনের জন্যে অচেনে করেছে। কারোর ওপর ওর যেমন কোনো বিদ্বেষ নেই, তেমনি ওর কোনো শত্রু নেই বললেই চলে। লড়াইটা ওর কাছে একটা ব্যবসা। রিক্সের মধ্যে ও আচ্ছাদিত হয়ে যখন, ধাক্কা করবার জন্যেই হানে। বাকবন্ধ করবার জন্যেই হানে। কিন্তু তার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কাজ করে না। এটা সাদাসিধে লেনদেনের ব্যাপার। লোকে যে পরস্পর দিয়ে চিহ্নিট কেটে খেলা দেখতে হাতির হয় সে তো একজন আরেকজনকে গায়ের জোরে হারিয়ে দিচ্ছে দেখবার জন্যেই। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে টম লন্ডনে নেমেছিল উল্লেখ্য গজারের বিরুদ্ধে। তার মাত্র চার মাস আগে নিউ জ্যোসেলের লড়াইয়ে গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। সব জেনে শুনেই টম ওর ভাঙা চোয়ালটাকেই তার আক্রমণের লক্ষ্য করে নবম রাউন্ডে আবার গজারের চোয়াল ভেঙেছিল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে গজারের ওপর তার বিশেষ কোনো রাগ ছিল। লড়াইয়ে জেতারবার এটাই ছিল সহজ উপায়। না জিতলে টাকা আসবে কোথাকে। গজারও এর জন্যে টমের ওপর আনৌ বিরূপ হয় নি। এইটাই তো খেলা আর খেলতে যখন ওরা নামে তখন নিয়ম জেনেই নামে।

টম কিং কোনোদিনই বেশি কথার মানুষ নয়। জানানার ধারে বাসে বিশ্ব দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে ছিল হাত দুটোর দিকে। হাতের উলটো পিঠে শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে আছে। আঙুলের গাঁটগুলো বারবার চোট খেয়ে খেঁতলে যে বিশ্রী আকার ধারণ করেছে তার থেকেই বোঝা যায় এগুলোকে কোন কাজে লাগানো হয়েছে। শিরা উপশিয়ার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগসূতরের কথা টম কিং জানে না কিন্তু কেন ওগুলো অমন ফুলে উঠেছে সেটা জানে। ওর হৃৎপিণ্ড বারংবার উচ্চ চাপে এবং অত্যধিক মাত্রায় রক্ত সরবরাহ করেছে শিরোগুলোয়। দীর্ঘদিন এই ঘটনা ঘটেছে থাকায় শিরাগুলো এখন আর কোনো সময়েই সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে না। শিরার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে টমের সব ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে। এখন ও অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন ও আর আগের মতো কুড়ি রাউন্ডের লড়াই চালাতে পারে না। এক রাউন্ডের পর আর এক রাউন্ড চাঙ চঙ ঘণ্টাধর্মি, কিন্তু প্রচণ্ড লড়াই, লড়াই আর লড়াই, মারের বলা মার, দড়ির ওপর আছড়ে পড়া ও প্রতিপক্ষকে আছড়ে ফেলা, আর ওগুদের শেষ মার দিতে শেষ রাউন্ডে দর্শকদের কানফাটা চিংকারের মধ্যে বারবার ছুটে যাওয়া, বারবার ঘুরির বন্যা বওয়ানো, বারবার মাথা নুইয়ে আচ্ছাদিত বাঁচানো। কিন্তু এর জন্য তখন তার বিশ্রান্ত হৃৎপিণ্ড ও সবল ধর্মি দিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাজা রক্তের বন্যা বওয়াত। সেই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠত প্রতিটি ধর্মি। আবার প্রয়োজন ফুরালে আগের আকার ধারণ করত। পুরোপুরি আগের আকার ফিরে পেত বলা ভুল, কারণ যত সামান্যই হোক, দৃষ্টিতে হরা না পক্ষ, শিরাগুলো কিন্তু প্রতিবারের একটু একটু করে আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শির ফোলা খেঁতলানো হাতের দিক চেয়ে টমের মনে পড়ে যায় তার তরুণ বয়সের সাফল্যের কথা। ওয়েলশের আতঙ্ক নামে পরিচিত বেনি জোনসের মাথায় খুঁবি চালিয়ে সেই প্রথম ওর আঙুলের গাঁট খেঁতলে গিয়েছিল।

খিমেটা আবার মাথা চাচাড় দেয়।

‘লিবি, এক টুকরো মাংসের ব্যবস্থা করা যায় না?’ হাতের বিরাট মুঠোটা পাকিয়ে বিভ্রূভ করে উঠল টম। তারপর চাপা গলায় একটা অশালীন মন্তব্য করল।

‘বার্ক আর সলির ওখানে দুজায়গাতেই চেষ্টা করেছি।’ প্রায় ক্ষমাপ্রার্থীর মতো বলল লিবি।

‘দিল না?’

‘আধ পেনিও না। বার্ক বলল—’ লিবির কথা আটকে যায়।

‘ধামলে কেন, বল দী বলেছে?’ প্রায় হুমকি দেয় টম।

‘মালছা সাল ডেলের সঙ্গে আজ রাতিরে তোমার লড়াইয়ের কথা জানে কিন্তু ... তাছাড়া ইতিমধ্যেই অনেক বাকি পড়ে গেছে।’

টমের মুখ থেকে একটা বিরক্তিসূচক ধ্বনি ছাড়া আর কোনো কথা শোনা যায় না। মনে পড়ে যায়, পোষা বুলটেরিয়ার কুকুরটাকে একদিন ও বেহিসাবে মাংস খাইয়েছে। বার্কও তখন ধার দিতে কিছুমাত্র গররাজি হত না। কিন্তু সময় বদলে গেছে। টম কিং-এর এখন বয়স হয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাব আয়োজিত মুষ্টিযুদ্ধের আসরে নেমে কোনো প্রোট মুষ্টিযোদ্ধা কখনো দোকানির কাছ থেকে বেশি ধার আশা করতে পারে না।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে ওঠা অবধি একটু মাংস খাবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে রয়েছে। আজকের লড়াইয়ের জন্যে উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের সুযোগ পায় নি টম। অনাবৃষ্টির দরুন এ বছর অস্ট্রেলিয়ার যে কোনো ধরনের একটা সাময়িক কাজ জোগাড় করাও শক্ত হয়ে পড়েছে। প্র্যাকটিস করার মতো সহকারী অবধি নেই টমের। ভালো খাবার তো দূরের কথা, সব সময় পেট ভরা খাবারও জোটে নি। যখন যেমন সুযোগ পেয়েছে দুএকদিন করে মাটি কটার কাজ করেছে আর প্রতিদিন ভোরবেলা নিয়ম করে দৌড়েছে যাতে পায়ের জোর না হারায়। তবু মুঠো নাবালক বস্তান আর স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার পর একা একা সঙ্গী ছাড়া প্র্যাকটিস করা একে দুর্কহ কাজ। স্যান্ডেলের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা যোষণা হবার পরেও দোকানদারের কাছে কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় নি। শুধু ‘গেইট’ ক্লাবের সেক্রেটারি তাকে তিন পাউন্ড দিয়েছিলেন। লড়াইয়ে হারলেও এই তিন পাউন্ড তার পারার কথা। সেই জন্যেই তিন পাউন্ডের বেশি ধার হিসেবে দিতে সেক্রেটারি রাজি হন নি। পরোনো বছরের কাছ থেকে মাঝেসাঝে দুটার শিল্পিত চেয়ে চিন্তে এনেছে, এ বছর থরা না হলে তারা নিশ্চয় আরো বেশি দিতে পারতো। স্বীকার না করে উপায় নেই যে সতিই ওর ঠিকমতো ট্রেনিং হয় নি। আরো ভালো শাওয়া-নাওয়ায় প্রয়োজন ছিল, সব দৃষ্টিভ্রান্ত হাত থেকে মুক্তি পাওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া চল্লিশ বছর বয়সে একজনকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হতে হলে যে কষ্ট পোয়াতে হয়, বিশ বছরের তরুণকে নিশ্চয় তা হয় না।

‘কটা বাজল লিবি?’ টম জিজ্ঞেস করল।

লিবি উঠে গিয়ে পারের বাড়ি থেকে সময় জেনে এল। ‘আটটা বাজতে পনের।’

‘আর দুচার মিনিটের মধ্যেই প্রথম খেলাটা শুরু হবে। তবে ওটা শুধু যাচাই করে দেখার জন্যে। এরপর হবে ডিলার ওয়েলশ আর গ্রিভলির চার রাউন্ডের খেলা। তারপর স্টারলাইট আর একটা নাবিকের মধ্যে দশ রাউন্ড। কাজেই ঘণ্টাখানেকের আগে আমার ডাক পড়বে না।’

আরো মিনিট দশেক মুখ বুজিয়ে কাটিয়ে দিখে টম উঠে দাঁড়াল।

‘আসলে কী জানো লিজি, আমি একেবারেই প্র্যাকটিসের সুযোগ পাই নি।’

চুপচাপ হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায় টম। লিজিকে চুমু খাবার কোনো ইচ্ছে প্রকাশ পায় না। এটা টমের চিরকালের স্বভাব। বেরোবার মুখে কোনোদিন চুমু খায় না। আজ লিজি কিন্তু দুহাতে টমের গলা জড়িয়ে ধরে প্রায় জোর করে ওর মাথা নুইয়ে চুমু খেল। বিশাল চেহারার টমের পাশে লিজিকে যেন পুতুলের মতো দেখায়।

‘গুড লাক টম! জিততে হবেই কিন্তু—’ লিজি বলল।

‘হ্যাঁ, জিততে হবেই।’ ফের একই কথা বলে টম। ‘এটাই এখন একমাত্র কাজ—জেতা-জিততে হবেই।’

টম হেসে ওঠে। বৃষ্টি হবার ভাব দেখাতে চায়। লিজি ওকে আরো জড়িয়ে ধরে। লিজির কাঁধের ওপর দিয়ে তাকায় টম। আশ্রয়বাহীন ফাঁকা একটা ঘর। টমের নিজের বলতে আছে এই ঘরখানা, লিজি আর তার দুই সন্তান। তাও বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে। সঙ্গিনী আর ছানাদের খাদ্য সংস্থানের জন্যে এই আশ্রয়না ছেড়ে নিশ্চিতি রাতে অভিযানে বেরোতে হচ্ছে টমকে। বর্তমান যুগের কলকারখানার মজুররাও যন্ত্রের মাধ্যমে নিজদের পেয়াই করে খাদ্য সংস্থানের জন্যে। কিন্তু টমের পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই প্রাচীন আদিম রাজকীয় ভঙ্গিতে বন্য পশুর মতো লড়াই করে সপ্তাহ করছে ও খাদ্য।

‘হারাতেই হবে—হারাতেই হবে।’ টম মরিয়া হয়ে উঠছে বোঝা যায়। ‘জিততে পারলেই তিরিশ ডলার। সব ধার শোধ হয়েও কিছু থেকে যাবে। হারলে একটা কনাকড়ি পার না। টামে চড়ার পয়সা অবশি না। হেঁটে ফিরতে হবে। চলি তা হলে—জিততে যদি পারি সেজা ফিরে আসব বাড়িতে।’

‘আমি ভেগে থাকব—’ টমের পেছন থেকে গলা চড়িয়ে বলল লিজি। পুরো দুমাইল হেঁটে গেছিটতে পৌছতে হবে। টমের মনে পড়ে যায়, একদিন সে নিউ সাউথ ওয়েলশের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিল। তখন টায়রি ছাড়া লড়াইয়ের আসরে যাবার কথা ভাবাই যেত না। তাছাড়া টম জিতবে বলে যারা জব্বার বাজি ধরত তাদের মধ্যে কেউ না কেউ সন্দেহ থাকত। টমি বার্নস ছিল—ইয়াকি জ্যাক জনসন ছিল—ওরা নিজদের গাড়ি নিয়ে আসত। টম হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে। সবাই জানে বক্সিংয়ের আগে দুমাইল পথ হাঁটা কোনো কাজের কথা নয়। টমের বয়স হয়ে গেছে আর বয়স্ক লোকদের ওপর পৃথিবী বড়ই বিরাট। এখন মাটি কাটার কাজ ছাড়া ওর আর কিছুই মানায় না, কিন্তু সেখানেও ওর এই ভাঙা নাক আর স্কীটকায় কান দুটো প্রতিবন্ধক। টম ভাবে কী কৃষ্ণশেঁই না সে কোনো হাতের কাজ শেখে নি। শিখত যদি শেষ পর্যন্ত কাজেই লাগত। কিন্তু সে কথা কেউ তাকে বলে নি। অবশ্য বললেও সে উপদেশ কাজে নিত না টম। তখন কীভাবে পুরো ছবিটাই ছিল রঙিন। সহজলভ্য অর্থ—ভাঁড় গৌরবময় লড়াই—দুই লড়াইয়ের মাঝে অফুরন্ত অবসর—উচ্চাঙ্গ সমর্থকদের ভিড়—পিঠ চাপড়ানি—করমর্দন—পাঁচ মিনিট কাজ বলার জন্যে ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ—লড়াইয়ের আসরের হর্ষধ্বনি—লড়াইয়ের অন্তিমে বড়ের মতো আঘাতহানা আর রেফারির ঘোষণা—‘কিং—এর জিত।’ পরের দিন সকালে খবরের কাগজেও খেলার পাতায় নাম!

সে সব দিনের কথাই ছিল আলাদা। এখন কিন্তু টম ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে যে সে শুধু পুরোনোদেরই সেদিন বাতিল করে দিয়েছে। উঠতি যৌবন হিসেবে প্রবীণদের তলায় টেনে নামিয়ে দিয়েছে। কাজেই অবাক হবার কিছু নেই যে কাজ হাসিল করতে তাকে কোনো বেণ পেতে হবে নি। তাদের সন্তানেরই ছিল স্কীটকায় হাতের শিরা, খেঁতলানো

আঙুলের গাঁট আর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত দেহ—বৃদ্ধ যোদ্ধা। রাশে কাটার্স্ বের লড়াইয়ে অষ্টাদশ রাউন্ডে প্রবীণ স্টাউশার বিলকে হারাবার কথা মনে পড়ে যায় টমের। লড়াইয়ের পর ট্রেসিগুকেম বসে শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েছিল বিন। হয়তো বিলেরও বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছিল। হয়ত বাড়িতে ছিল বো। আর ছেলেমেয়ে। হয়তো সেদিন লড়াইয়ের আগে বিলও এক টুকরো মাংস খাবার জন্যে আব্দুল হয়েছিল। আজ টম বুঝতে পারছে যে কুড়ি বছর আগে সেই দিনটিতে বিল তার চেয়ে অনেক বেশি কৃৎসি মাংস নিয়ে লড়াইয়ের আসরে নেমেছিল। তারের মতো সে শুধু খ্যাতি আর সহজলভ্য অর্থ কুড়াতে আসে নি। তাই হেরে যাবার পর বিলের কান্নাটোও খুব স্বাভাবিক।

একটা মানুষের লড়াইয়ের ক্ষমতা সীমিত। এর কোনো ব্যতিক্রম হবার উপায় নাই। কেউ একশোটা লড়াইয়ের পর ফুরিয়ে যায়। আমার ভেঁদে মাত্র কুড়িটার পরই শেষ। সবটাই নির্ভর করে মানুষটার দৈহিক গঠনের ওপর, তার পেশির তরঙ্গীলোর উৎকর্ষের ওপর। নিখারিত সংখ্যক লড়াইয়ের পর তাই কারো পক্ষেই আর কিছু করা সম্ভব নয়। বড় কঠোর এই প্রাকৃতিক বিধান। আর পাঁচ জনের চেয়ে টমের ক্ষমতা বেশিই ছিল বলতে হবে। সেই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে হয়ে গেছে লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে। জান-প্রাণ উজ্জার করে লড়াই—হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস ফাটিয়ে—ধর্মনিষ্ঠে স্ক্রীত করে। এজন্যেই যৌবনের নমনীয় মাসেস্পেশিগুলো দৃষ্টির মতো গাঁট পাকিয়ে গেছে। দেহা দিয়েছে স্নায়বিক দুর্বলতা। সহ্যশক্তি কমে এসেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে কিমিয়ে পড়েছে দেহ মন। হ্যাঁ, আর প্যাঁজনের তুলনায় টম অনেক বেশি সাক্ষ্য অর্জন করেছে। তার পুরোনো মুষ্টিযোদ্ধা বন্ধুদের কেউই আর টিকে নেই। এক এক করে সবাই বিদায় নিয়েছে আর তাদের সেই বিদায়ের আয়োজনে টমও অনেক সময় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রবীণদের বিরুদ্ধে তাকে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর টমও এক এক করে সবাইকে অপসারিত করে গেছে। স্টাউশার বিলের মতো কেউ যখন ট্রেসিগুকেম বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছে ও তখন হেসেছে। এখন টম নিজে প্রবীণদের দলভুক্ত। তার বিরুদ্ধে তাই লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে নবীনদের। আবারও এই স্যাভেল ছোকরাটা এসেছে নিউজিল্যান্ড থেকে। সেখানে নাকি নামও কিনেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় কেউ তার সম্বন্ধে কিছু জানে না বলেই টমের সঙ্গে এই বক্সিংয়ের আয়োজন। স্যাভেল যদি আজ তাগাদ দেখাতে পারে তাহলে আরো নামকরা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ার, আরো বেশি অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পাবে। কাজেই স্যাভেল আজ জেতার জন্যে চেষ্টার কসুর করবে না। অর্থ, খ্যাতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হাতছানি দিচ্ছে স্যাভেলকে। সৌভাগ্য আর স্যাভেলের মাঝে বাধা বলতে এখন শুধু আছে পুরোনো দাবু টম কিং। যে টমের পাখনা খুব বেশি হলে তিরিশটা মাত্র ডলার। বাড়িআলি আরো তোকানির ধার শোধ করতেই যা খরচ হয়ে যাবে। ভারতে ভারতেই এক সময় টমের চোখের সামনে তারুণ্য যেন রক্ত মাংসের রূপ ধারণ করে। তারুণ্য—মহান তারুণ্য—অজ্ঞেয় আর উৎফুল্ল—উজ্জীবিত পেশি ও গায়ের রেশম কোমল চামড়া—অক্লান্ত অবিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস। যে তারুণ্য শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব দেখলেই ফেটে পড়ে হাসিতে। তারুণ্যই বিক্ষোভের দেবতা। পুরোনোকে সে ধ্বংস করে আর তার সঙ্গে নিজেকেও তিল তিল করে খুইয়ে ফেলে। ক্রমশ তারও ধর্মনি আকারে বৃদ্ধি পায়, আঙুলের গাঁটগুলো যায় খেঁতলে আর একদিন সেও পড়ে যায় পুরোনো বাতিলদের দলে। কারণ তরুণ যা তা চির তরুণই থাকে, শুধু যুগটিই যা পাল্টে যায়।

কাসেলরিগ স্ট্রিটে পা দিয়ে বা দিকে মোড় নিল টম। তিনটি বাড়ির পরেই গেছিট। এক

দঙ্গল ছোঁকা প্রবেশ পথের মুখেই ভিড় জমিয়ে ছিল। ওকে দেখে সসম্মানে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। টম স্তন্যতে পেল ওয়া ফলাফলি করতে, টম কিং। এই তো টম কিং।

ড্রেসিংরুম চোকবার আগেই ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা। যুবকটির চোখ মুখে ধূততার ছাপ। করমর্দন করে বলল, 'কেমন লাগছে বলুন?'

'চমৎকার! পুরোপুরি ফিট।' টম জেনে শুনে ভাষা মিথ্যে কথাটা বলল। পরসা থাকলে এখনি ও একটি মাসে খাবার ব্যাবস্থা করত।

ড্রেসিংরুম ছেড়ে বারান্দা পেরিয়ে হলঘরের মাঝে ঢোকা রিঙের কাছে এসে দাঁড়াতেই অপেক্ষারত জনতা হর্ষবনি করে অভিবাদন জানাল। একবার ডান দিকে আর একবার বাঁ দিকে ফিরে টমও অভিবাদন সাড়া দিল। বলতে গেলে সবই অচেনা মুখ। একবার ভাগই কিশোর। টম যখন প্রথম নাম করেছে তখন এদের অনেকেই বোধ হয় জন্মায়ও নি। উচ্চ মঞ্চটার ওপর এক লাফে উঠে এল টম। ঝাড় নুইয়ে দড়ির তলা দিয়ে ঢুক এক কোণে নিজের জায়গায় চলে এল। ফোল্ডিং টুলের ওপর বসল। রেফারি জ্যাক বল এগিয়ে এসে করমর্দন করল। বল ও এককালের পেশাদার ব্রায়ার। অবস্থা দশ বছর আগেই সে লড়াই ছেড়ে দিয়েছে। বলকে রেফারি দেখে কিং বৃথি হয়ে। পুরোনা দিনের লোক বল, স্যাণ্ডেলকে একটু বেআইনিভাবে মারধোর করলেও বল সেদিকে নজর দেবে না।

এক এক করে ভারী হেভিওয়েট ব্রায়ার রিঙে উঠছে আর রেফারি তাদের পরিচয় পেশ করছে। তাছাড়া তারা প্রত্যেকেই বাজি ধরছে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে।

বল যোষণা করল, 'নর্থ সিডনির ব্রায়ার প্রটো আঙ্কের লড়াইয়ের বিজয়ীকে পঞ্চাশ পাউন্ড বাজি ধরে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।'

স্যাণ্ডেল রিঙের মধ্যে লাকিয়ে উঠেই দর্শকরা বরাবর হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। নিজেই জায়গায় গিয়ে বসল স্যাণ্ডেল। রিঙের বিপরীত কোণ থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল টম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা দুজনে নির্দিষ্ট সপ্তাহে জড়িয়ে পড়বে। বিপক্ষকে আঘাতে আঘাতে উচ্চৈশ্বর্য আর ধরাশায়ী করার জন্যে ওরা প্রত্যেকেই তাদের দেহের শেষ বিদ্যুৎ শক্তিকেও উজ্জ্বল করে দেবে। কিন্তু স্যাণ্ডেলও টমের মতো রিঙ কন্টিউমের ওপর শোয়েটার আর ট্রাউজার চড়িয়ে রেখেছে, তাই দেখে বিশেষ কিছু বোঝবার উপায় নেই। সুদর্শন মুখশ্রী—মাথা ভর্তি কোঁকড়া ঘন হলদে রঙা চুল। সুপুঁই পেশিচ্ছল ঘাড়টাই তার শক্তিমত্তার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তরুণ প্রটো রিঙের দুপাশে গিয়ে স্যাণ্ডেল আর টমের সঙ্গে করমর্দন সেরে নেমে গেল। একের পর এক তরুণ মুষ্টিযোদ্ধারা উঠে আসছে আর তাদের লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এই মুখগুলো সবাইই অপরিচিত কিন্তু যৌবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তারা সরব—দুনিয়ার মানুষের সামনে তাদের বলিষ্ঠ উক্তারণ—শক্তি আর নিপুণতার জোরে তারা আঙ্কের বিজয়ী যোদ্ধাকে আগামী দিনে পরাস্ত করবেই করবে। আগে হলে টম কিং মজা পেত, হয়ত বিরক্তিও বোধ করত। লড়াইয়ের আগে এইসব অনুষ্ঠান দেখে এখন কিন্তু আগ্রহই বোধ করছে সে। অজ্ঞেয় যৌবনকে প্রত্যক্ষ করছে। যৌবন চিরকালই ঠিক এইভাবে দড়ি-পলি লাকিয়ে উঠেছে রিঙের ভেতর, উপেক্ষাক্রমে ছুঁড়ে দিয়েছে উজ্জ্বল চ্যালেঞ্জ আর বার্ষিক্যও চিরকাল নত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে হার। বৃদ্ধ যোদ্ধাদের মাড়িয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে যায় তরুণরা।

অতৃপ্ত অপ্রতিরোধ্য তরুণের স্রোত বৃদ্ধদের দেয় ভাসিয়ে। তারপর ওই তরুণরাও

একদিন বৃদ্ধ হয়, তারাও আবার সেই একই পতনের পথের পথিক হয়। চিরজয়ী শাস্বত তারুণ্য।

জেন্সবস্ত্রের দিকে তাকিয়ে টম কিং 'স্পোর্টসম্যান' কাগজের মরণ্যান, আর 'রেফারি' কাগজের করবেটকে দেখতে পেয়ে ঝাড় নাড়ল। টম এবার দুহাত উঁচু করে ধরতেই তার সহকারী সিড সুলিভান ও চার্লি বেটস গ্লাভস পরিয়ে দিয়ে শক্ত করে ফিতে বেঁধে দিল। স্যাণ্ডেলের একজন সহকারী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পরখ করছিল টমের আঙুলের গাঁটের ওপরকার ছোট ছোট ব্যাণ্ডেজগুলো। ওদিকে টমের একজন সহকারী স্যাণ্ডেলের কাছে দাঁড়িয়ে একইভাবে নজর রাখছে। স্যাণ্ডেলের প্যান্টটা টেনে খুলে নিতেই সে উঠে দাঁড়াল। এবার সোয়েটারটা টেনে তুলে নেওয়া হল মাথা গলিয়ে। টম দেখে তারুণ্য মানুষের রূপ ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুস্থ সবল দেহের গায়ের চামড়ার নিচে মাংসপেশিগুলো জীবন্ত প্রাণীর মতো খেলা খাচ্ছে। সারা শরীর জুড়ে শুধু চক্ষু প্রাণের স্বাক্ষর। টম জানে ওর এই সতেজ প্রাণের নির্খাসের একবিদ্যুৎ এখানে অসংখ্য আঘাতজনিত ক্ষতমুখ দিয়ে ঝরে পড়ে নি। লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে তার তারুণ্য এখনো খসোত দিতে শুরু করে নি।

ওরা দুজনে এবার এগিয়ে আসে মঞ্চের মাঝখানে। ঘন্টা পড়তেই সহকারীরা ভাঁজ করা চোয়ার দুটো তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। স্যাণ্ডেল আর টম করমর্দন সারামাত্র ওদের পেছদুটো যোদ্ধার ভঙ্গি গ্রহণ করল। সূক্ষ্ম কেবের বীধন ছিড়ে ইস্পাত আর শিল্পে গড়া যন্ত্রের মতো ছোটকি করে উঠল স্যাণ্ডেল। একবার এগিয়ে, একবার পিছিয়ে বাঁ হাতে ঘৃষি মারল কোঁচ, ডান হাতে ঘৃষি মারল, তারপর প্রত্যাঘাত এড়িয়ে লচুপায়ে নেচে পিছিয়ে এসেও ফের এগিয়ে এল হিঁসে হয়ে। স্যাণ্ডেল অত্যন্ত তৎপর আর চতুর। চোখ ধাঁধানো প্রদর্শনী। দর্শকরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। টমের কিন্তু ঠাণ্ডা মাথা। অভিজ্ঞ যোদ্ধা টম এমন সঠিক ছোঁকাদের সঙ্গে কতবার যে লড়াইয়ে তার ইয়ত্তা নেই। স্যাণ্ডেলের ঘৃষিগুলোর হট্টম মতো তাল জানা। এই দ্বিভিত আক্রমণ মারাত্মক নয়। জানা স্যাণ্ডেল প্রথম থেকেই ছটোপাটি করবে। এটা যৌবনের ধর্ম। বিব্রোহে উদ্ভাদ। অকুরন্ত ক্ষমতা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে যৌবনের দর্পে ফেটে পড়ে। ক্রুদ্ধ আক্রমণে বিপর্যস্ত করে দেয় প্রতিপক্ষকে।

স্যাণ্ডেল একবার এগোচ্ছে একবার পেছোচ্ছে। একবার এখানে একবার ওখানে। উদ্দীপনা যেন চক্ষু পায়ে চষে ফেলছে সারা মঞ্চটা। সাদা চামড়া আর মাংসপেশীর আশ্চর্য মহিমা। দেহটা যেন মাকুর মতো উঠছে লাফাচ্ছে পিছলে বেরিয়ে আসছে আর রচনা করছে আক্রমণের এক চোখ ধাঁধানো জাল। আক্রমণের পর আক্রমণ—হাজারো আক্রমণ, কিন্তু লক্ষ্য একটাই। টম কিংকে ধ্বংস করা। টম কিং যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যাণ্ডেল আর তার সাফল্যের মাঝখানে। টম অত্যন্ত সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে যায় আঘাতগুলো। সে তার করণীয় সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। টম যৌবন পার করে এসেছে তাই যৌবনকে চিনতে আর তার বাকি নেই। যতক্ষণ না স্যাণ্ডেলের ঘাটিকা দমে বেরোচ্ছে কিছু করবার নেই। টম ইচ্ছে করে মাথা নুয়েই একটা ঘৃষি খেল মাথায়। দাঁতে দাঁত টিপে হাসে টম। শয়তানি করেছে ঠিকই কিন্তু খেলার নিয়ম ভেঙে করে নি। নিজের হাতের আঙুলের গাঁট বাঁচাবার দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজের। তারপরেও কেউ যদি কারোর মাথার ওপর ঘৃষি কষাতে চায়, নিজের ক্ষতি করে—কেউ বাধা দেবে না। টম ইচ্ছে করলে মাথটা আবেকটু নিচু করতে পারত, তাহলেই ঘৃষিটা ফস্কে যেত। টম তা করে নি। কারণ

তার মনে পড়ে গিয়েছিল 'ওয়েলসের আতঙ্ক'-এর মাধ্যম সেই প্রথম আঙুলের গাঁট খেঁতলে যাবার কথা। মাথাটা পুরোপুরি নিচু না করার জন্যে স্যান্ডেলেরও আঙুলের একটা গাঁট খসে হয়ে গেছে। অবশ্য এই নিয়ে স্যান্ডেল এখন মাথাও ঘামাবে না। কোনো জ্যাকপে না করেই সে এমনি বীরদর্পে আঘাতের পর আঘাত হেনে যাবে লড়াইয়ের শেষ মুহূর্ত অবধি। কিন্তু একদিন আসবেই যখন একের পর এক লড়াইয়ে নামার ফল ফলতে শুরু করবে।

খেঁতলানো গাঁটগুলোর দিকে তাকিয়ে তখন অনুশোচনা হবে। মনে পড়ে যাবে টম কিং-এর মাধ্যম ঘুমি মেরে প্রথম আঘাত পাবার কথা।

প্রথম রাউন্ডের পুরো সাক্ষাৎটুকু একা বেড়ে নেয় স্যান্ডেল। ঘূর্ণিঝড়ের মতো তার ক্ষিপ্ত আক্রমণ উল্লসিত করে প্রতিটি দর্শককে। ঘূর্ণির বন্যায় টমকে দিশাহারা করে দেয়। টম কিছুই করছে না। একবারও পাল্টা ঘুমি চালায় নি। শুধু আঘাত বাচাতে নিজেকে আড়াল করেছে, বাধা দিয়েছে, মাথা নামিয়ে নিয়েছে। সরাসরি আঘাত পেয়ে কখনো আবার ভান করেছে যেন মাথা ঘুরে গেছে। মাথা ঝাঁকতে ঝাঁকতে শ্রুত ভঙ্গিতে সরে এসেছে। একবারও লাফায় নি বা ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। শরীরের এক বিন্দু শক্তিও হুপচৎ করে নি। স্যান্ডেলের ফেনিল যৌবন সম্পূর্ণভাবে উপচে না পড়া পর্যন্ত বিচক্ষণ প্রব্রাণ প্রতিশোধ নিতে সাহস পায় না। শীতল চোখ দুটো শুধু চেয়ে থাকে আর দূরত্বের মাপ নেয়। ওর ক্লান্ত অলস চোখের দৃষ্টি ভ্রম সৃষ্টি করে—মনে হয় ও বুঝি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। আসলে কিন্তু কিছুই ওর দৃষ্টি এরাচ্ছে না। কুড়ি বছরেরও বেশি দড়ি থেরা মক্কের ভিতর কাটানোর সুবাদে তার চোখের নজর তৈরি হয়ে গেছে। আসন্ন আঘাতের আশঙ্কায় চোখের পাতা কাঁপে না বা পড়ে না। শীতল চোখ দুটো শুধু চেয়ে থাকে আর দূরত্বের মাপ নেয়।

প্রথম রাউন্ডের পর রিঙ্কের কোণে বসে নির্ধারিত এই মিনিটকাল বিশ্রাম উপভোগ করছিল টম। পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে—হাতপট্টার ভর রেখেছে পিছনের দড়ির ওপর। সহকারীরা তোয়ালে নেড়ে বাতাস করছে আর বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে টম। পেট আর বুক মনোমগ্ন ওঠানামা করছে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে টম। কানে আসছে দর্শকদের নানা প্রশ্ন, 'লড়ছে না যে টম?'—'ভুমি ওকে ভয় পাচ্ছে নাকি?'

'সব পেশি আড়ষ্ট হয়ে গেছে।' সামনের আসন থেকে একজনকে মন্তব্য করতে শুনল। 'এরচেয়ে তাড়াতাড়ি নড়তে পারে না। স্যান্ডেলের ওপর নগদ বাড়ি ধরছি—টু টু ওয়ান।'

ঘণ্টা পড়তেই দুজনে নিজেদের জায়গা ছেড়ে সামনে এগিয়ে এল। টম যত না এগোয় স্যান্ডেল তিনগুণ। স্বভাবতই স্যান্ডেল ব্যগ্র। টম কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট। এটা এত হিসেবির মনোবৃত্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। টমের ট্রেনিং জোটে নি, ভালো করে খাওয়াও হয় নি, কাজেই প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পাক্সা দু মাইল হেঁটে এসেছে। ঠিক প্রথম রাউন্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবারও। ঘূর্ণিঝড়ের মতো স্যান্ডেলের আক্রমণ আর নিজস্ব টম কিং। ক্ষুদ্র দর্শকরা বারবার জনতে চাইছে টম কেন লড়ছে না, টম শুধুই ভান করছে। ঘণ্টা বা দু একটা ঘুমি মেরেছে তার পিছনে না ছিল পাতা না কোনো শক্তি। নিজেকে আড়াল করা আর সরিয়ে নেওয়া ছাড়া কিছুই করে নি। স্যান্ডেল চাইছে লড়াইয়ের মধ্যে ক্ষিপ্ততা আনতে, কিন্তু অভিজ্ঞতার জোরে টম তাকে সে সুযোগ দিচ্ছে না একেবারে। ব্যথাভরা অদ্ভুত এক ধরনের চাপা হাসির আভাস ফুটে উঠেছে টমের আঘাত জরজরত ভাঙচোরা মুখটিয়। এমন ব্যাকুলভাবে নিজের ক্ষমতাকে কয়েক করে রাখার সামর্থ্য শুধু

বয়সের সঙ্গেই আসে। স্যান্ডেল মানাই যৌবন আর যৌবন নিজের শক্তি সামর্থ্যকে এমনি অবহেলা ভরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। রিঙ্কের অধিনায়ক কিন্তু টম। একের পর এক ভিত্তি সুদীর্ঘ যুদ্ধে অশেষহরণের সুবাদে সে অর্জন করেছে তার বিচক্ষণতা। স্থির দৃষ্টিতে ঠাণ্ডা মাথা নজর রাখছে টম। মধুর পদক্ষেপ। স্যান্ডেলের সঙ্গে যৌবন উপছে না পড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষাক্ষী করবে। অধিকাংশ দর্শকই ভাবে যে স্যান্ডেলের সঙ্গে টমের কোনো তুলনাই চলতে পারে না। বাড়ির হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় তিনে এক। এরই মধ্যে কিন্তু কিছু বিজ্ঞ লোকও আছে। এরা আগে টমের লড়াই দেখেছে। তারা টমের ওপরেই বাড়ি ধরে নিশ্চিত মনে।

যথারীতি তৃতীয় রাউন্ডের শুরু থেকেই স্যান্ডেলের একতরফা আক্রমণ শুরু হয়। তিরিশ সেকেন্ড পেরোবার পর স্যান্ডেলেরই অসাবধানতায় একটা সুযোগ পেয়ে যায় টম। তার চোখ বলসে গুঠে আর তারই সঙ্গে তড়িৎ-গতিতে এগিয়ে আসে ডান হাত। এই তার প্রথম মার—পেটানো ডান বাহুর কঠিনতা আর আর্থ বুদ্ধির সঙ্গে পুরো ভারসমত্ত হক করেছে। ভদ্রাচ্ছন্ন একটা সিংহ যেন আচমকা বাজ পড়ার মতো থাধা বসিয়ে দিয়েছে। আঘাতটা চোয়ালের বাড়ে লাগা মাত্র গলা কাটা গরুর মতো লুটিয়ে পড়ল স্যান্ডেল। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে শব্দে বাধা জানাল। লোকটা তাহলে একেবারে অচল নয়, ঘুমিটা যা বেড়েছে কামারশালার হাতুড়ির মতো।

স্যান্ডেল হতভম্ব হয়ে গেছে। মেয়ের ওপর এক পাক গড়িয়ে উঠে বসতে যায় কিন্তু তার সহকারীরা চিৎকার করে বারশ করে দেয় উঠতে। রেফারির সময় গণনা শেষ না হওয়া অবধি বিশ্রাম নেবার জন্যে উপদেশ দেয়। একটা হাঁটু মুড়ে তার ওপর হেঁদের ভার রেখে বসে স্যান্ডেল, যাতে যে কোনো মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতে পারে। রেফারি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এক দুই তিন করে জোরে জোরে গুণে চলে প্রতিটি সেকেন্ড। নয় গোনা হতেই যোদ্ধার ভিত্তি উঠে দাঁড়া স্যান্ডেল। টমের আপসোকে অন্ত নই। ঘুমিটা যদি আর এক হকি ওপাশে চোয়ালের ঠিক ভাঁজটার পয়ছ, পুরো নকশাউঠি হয়ে যেত স্যান্ডেল। তিরিশটা ডলার পকেটে পুরে সোজা বাড়ি ফিরে যেতে পারত। বী আর বাচ্চারা ওরই পথ চেয়ে বসে আছে।

পুরো তিন মিনিট পার করে রাউন্ড শেষ হবে। স্যান্ডেল এবার তার প্রতিপক্ষকে সমীচেরে চোখে দেখতে শুরু করেছে। টমের কিন্তু সেই আগের মতোই মনঃগতি, ঘুম-জড়ানো দৃষ্টি। রিঙ্কের পিছনে সহকারীদের অপেক্ষা করতে দেখেই টম বুঝতে পারে লড়াই শেষ হবার সময় হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় সে। লড়াইটাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করে যাতে টমের সে তার নিজের দিকের কোণারটা কাছে এগিয়ে আসতে পারে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে টম তার টুলটার ওপর বসে পড়ে। স্যান্ডেলকে কিন্তু কোনোদুনিভাবে হেঁটে পুরো মঞ্চটা পার হয়ে নিজের জায়গায় পৌছতে হয়। ব্যাপারটা সামান্য কিন্তু এই রকম অনেকগুলো সামান্য ব্যাপার যখন একসঙ্গে দানা বাঁধে তখন আর তা সামান্য থাকে না। ওই কপা বেশি হাঁটতে বাধা হয়েছে স্যান্ডেল, ওইটুকু শক্তি বেশি খরচ করেছে, বিশ্রামের অত্যন্ত মর্যাদা এক মিনিট সময়ের থেকেও কয়েক সেকেন্ড খোয়া গেছে। প্রতি রাউন্ডের সূচনায় টম অত্যন্ত মনঃগতিতে আগ্রহ হয়েছিল আর স্যান্ডেলকে বেশি করে হাট্টিয়েছে। এবার প্রতিটি রাউন্ডের সমাপ্তির সময় দেখা গেছে চতুর্থ টম ঠিক স্বস্থানে ফিরে এসেছে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েছে নিজের টুলে। আরো দু রাউন্ড খেলা হয়ে গেছে। টম তার শক্তি ব্যয়ে যতটা কপণ, স্যান্ডেল ঠিক

ততটাই বেহিসেবি। স্যান্ডেল খেলার গতি বাড়াবার জন্যে সচেষ্ট হলে টম অবশিষ্টে পড়ে। স্যান্ডেলের অসংখ্য আঘাতের মধ্যে বেশ কিছু লক্ষ্যভেদ করেছে। তবু টম তার শ্রুতভঙ্গি ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। মাথাপরম ছোকরারা ওলিকে চেঁচিয়ে আসার মাত করছে—টমকে লড়তে বলছে। ষষ্ঠ রাউন্ডে স্যান্ডেল আবার অসতর্ক হতেই ডান হাতের ভয়াবহ ঘুষি এসে পড়ে তার চোয়ালে। আবার রেক্সারি নয় গোনা! অবধি পড়ে থাকে। সে। সপ্তম রাউন্ডেই স্যান্ডেলের অতি উৎসাহ কিম্বিমে আসে। বুঝতে পারে এটা তার জীবনের কঠিনতম লড়াই। টম কিং বুড়ো হতে পারে কিন্তু এ অবধি সে টমের মতো যোদ্ধার সম্পূর্ণ নয় নি। বুড়ো টম কখনো মাথা গরম করে না, তার আত্মরক্ষার কৌশল নিখুঁত, তার ঘুষির আঘাত যেন মুগুণের বা। আঘাত ডান জন বা, তাহা হতেই নক-আউট। তাহলেও টম কিন্তু বারবার আঘাত হানতে সাহস পায় না। আঘাতের ভাঙা গাঁতুলার কথা সে ভোলে নি। শেষ পর্যন্ত লড়তে হলে খুব বুঝসুখে প্রতিটি আঘাত হানা প্রয়োজন। টুলে বসে ও প্রান্তে স্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে টমের মনে হল ওর অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্যান্ডেলের যৌবনকে যদি যুক্ত করা যেত, সেটা নিকিতভাবে বিস্ময়েভিঙিয়েট চ্যাম্পিয়ানের জন্ম সিত। কিন্তু মুশকিল এই যে স্যান্ডেল কোনোদিনই বিশ্চ্যাপিয়ান হবে না। তার সে বিচক্ষণতা নেই। একমাত্র তার যৌবনকে বিকিয়ে সে তার অতিপ্রায় পূর্ণ করতে পারে। তারপর একদিন সে বিচক্ষণতা অর্জন করবে ঠিকই, কিন্তু ততদিনে তার যৌবন ফুরিয়ে যাবে।

যতকরমভাবে সম্ভব টম সুযোগ নিতে কসুর করে না। সুবিধে পেলেই সে আঁকড়ে ধরছে বিপক্ষকে। আর আঁকড়ে ধরার মুহূর্তে বলতে গেলে প্রতিবারই তার কাঁধটা স্যান্ডেলের পাঞ্জরে আঘাত করছে। মুষ্টিদ্বয়ের হিসেবে ঘুষির মতোই কার্যকর কাঁধটা। তাছাড়া এতে শক্তির অপচয়ও হয় অপেক্ষাকৃত কম। একবার আঁকড়ে ধরতে পারলে টম তার পুরো দেহের ওজনটা ছেড়ে দেয় বিপক্ষের ওপর। দুজনকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে তখন রেক্সারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় পড়ে। টম যখনই কাঁধ দিয়ে স্যান্ডেলের পাঞ্জরে গোঁড়া মেরে ওকে জাগটে ধরে, ওর মাথাটা টম স্যান্ডেলের বাঁ হাতের তলায়। স্যান্ডেল এই রকম সময় তার পিঠের দিক দিয়ে ডান হাত চালিয়ে টমের মুখে আঘাত করে। স্যান্ডেলের এই মারের চাতুর্ঘ্য দর্শকদের সহর্ষ তারিফ পায় কিন্তু তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। শক্তির অহেতুক অপচয়। স্যান্ডেলের দিক্ত জ্ঞান্টি নেই, কোনো বিকার নেই। টম মুচকি মুচকি হাসে আর সহ্য করে যায় মধ্যগুলো।

স্যান্ডেল এবার ডান হাতে পরপর কবার জোরাল ঘুষি চালায়। দেখে মনে হয় টম দারুণ মার খাচ্ছে। প্রাচীন মুষ্টিযোদ্ধারা কিন্তু জারিফ দেয় টমকেই। স্যান্ডেল দেই ঘুষি চালাতে যাচ্ছে টমের বাঁ হাতের গ্রাস্টিসটা নিপুণভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে স্যান্ডেলের ডান হাতের গুলি। ঘুষিগুলো টমের গায়ে এসে লাগছে ঠিকই কিন্তু তার শক্তি হ্রাস করে নিচ্ছে টমের এই সামান্য স্পর্শটুকু। নবম রাউন্ডের শুরুতে এক মিনিটের মধ্যে টমের ধনুকাকার ডানহাতের আঘাতে পরপর তিনবার স্যান্ডেলের অড ভারি দেহখানা লুটিয়ে পড়ল। প্রতিবারই নয় গোনা অবধি পুণ্যে সময়টার সত্তরবার করে তারপর স্যান্ডেল উঠে দাঁড়িয়ে। আঘাতে আঘাতে বিফল দ্বিগুণত। কিন্তু ক্ষমতা হারায় নি। স্যান্ডেলের আর সেই ক্ষিপ্রতা নেই। আগের মতো আর বেহিসেবি শক্তিকায়ও করছে না। দাঁতে দাঁতে টিপে লড়ে যাচ্ছে। তার প্রধান সম্পদ যৌবনের ভাঁড়ার থেকে যাচ্ছে স্বপ গ্রহণ করে চলেছে। টমের প্রধান সম্পদ কিন্তু অভিজ্ঞতা। তেজ আর প্রাণশক্তিতে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সযত্নে সূদীর্ঘ যোদ্ধা জীবনের অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে ঘাটতিটুকু পূরণ করে নিয়েছে চাতুর্ঘ্য।

নিজের দৈহিক শক্তির অপব্যয় রোধ করার জন্য একটিকও বাড়তি অঙ্গ সঞ্চালন তো নয়ই উপরন্তু প্রতিপক্ষকে সেই একই ভুল করতে বাধ্য করার কৌশল জানে টম। হাত পা আর দেহের ছলনাময় ভঙ্গিতে বারবার সে প্রলুব্ধ করছে স্যান্ডেলকে। অহেতুক স্যান্ডেল লাফিয়ে পিড়িয়ে যাচ্ছে, ঘাড় নোয়াচ্ছে বা আক্রান্ত হবার ভয়ে প্রতিরোধমূলক ভঙ্গি গ্রহণ করছে। টম ঠিক সুযোগ করে অবসর নিচ্ছে লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে, কিন্তু স্যান্ডেলকে এক মুহূর্তে নিক্ষেপ্ত থাকতে দিচ্ছে না। এটা পরিণত বয়সের নীতি।

দশম রাউন্ডের শুরুতেই টম বিপক্ষের আক্রমণ রোধ করতে সোজা স্যান্ডেলের মুখের উপর বাঁ হাতের ঘুষি বেড়ে গেল পরপর কবার। স্যান্ডেল শেষ পর্যন্ত পাশ্টা কৌশল হিসেবে টমের বাঁ হাতের ঘুষিগুলো মাথা ঠিকই এড়িয়ে দিয়ে হান হাতে হুক বাড়িতে শুরু করল টমের মাথায়। আঘাতগুলো ঠিক জায়গা মতো না লাগায় কার্যকর হয় নি। কিন্তু প্রথম আঘাতটা লাগার পর অচেতনতার সেই সুপরিচিত কালো পর্দাটা নেমে এসেছিল টমের দুচোখে, সেই মুহূর্তটিতে বা সেই মুহূর্তের এক ভগ্নাংশদ্বানেক সময় টম হারিয়ে গিয়েছিল। আঘাত পাবার আঘাতের মুহূর্তেও দেখেছিল স্যান্ডেল তার মার এড়াতে দৃষ্টিয়ে থেকে সরে যাচ্ছে—দেখেছিল অগণিত দর্শকের মুখগুলো ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। তারপরই অক্ষরার। আবার দৃষ্টি ফিরে পেতেই সেই দর্শকদের মুখ আর স্যান্ডেলকে দেখতে পেল টম। এতক্ষণ ঘুমোবার পর এই যেন চোখ খুলল। তবে সংজ্ঞাহীন মুহূর্তটি তিলমাত্র স্থায়ী হয়েছিল বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়বারও সময় পায় নি টম। দর্শকরা দেখে টম টলমল করছে, হাঁটুর জোর হারিয়ে ফেলেছে। পরক্ষণেই অবশ্য বাঁ কাঁধের আশ্রয়ে থুতনি গুঁজে নিজেকে সামলে নেয় টম।

পর পর কবার একই পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে যায় স্যান্ডেল। টম শেষ পর্যন্ত বিফলতা কাটিয়ে আত্মরক্ষার এবং পাশ্টা আক্রমণের উপায় বের করে। বাঁ হাতে ঘুষি মাঝবরা ভণিতা করে আঘ পা পিছনে সরে এসে সম্পূর্ণ শরীরের ওজনটুকু কাঁছে লাগায় ডান হাতের অপারকর ওপর। সময়ের নির্ভুল চিহ্নারে আঘাতটা সোজা গিয়ে পড়ে স্যান্ডেলের মুখের ওপর। আঘাতের প্রাণভাঙা স্যান্ডেলকে শুন্যে তুলে আছড়ে ফেলে। তার মাথা আর কাঁধে চোট লাগে। পরপর দুবার স্যান্ডেলকে একইভাবে ধরাশায়ী করে তারপর দড়ির ওপর ফেলে ঘুষির বন্যা বণ্ডায়। স্যান্ডেলকে এক মুহূর্ত অবসর দেয় না স্যান্ডেল ওঠার—মুহূর্তই আঘাতে জঞ্জরিত করে দেয়। উত্তেজনার সিঁট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রতিটি দর্শক। অবিরাম হর্ষধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ চঞ্চল। কিন্তু অসামান্য শক্তি আর সহ্যক্ষমতা স্যান্ডেলের। এখনো পায়ের ওপর ডর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। স্যান্ডেলের নক-আউট হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু এই বীভৎস অত্যাচারের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পুলিশের এক ক্যাপ্টেন রিভের ধারে উঠে আসে লড়াই থামিয়ে দেবার জন্যে। ঠিক একমিনি সময় ঘণ্টামিনি রাউন্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করে। টলমল করে নিষেধ জারগায় ফিরে আসে স্যান্ডেল। পুলিশের ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিবাদ জানায় লড়াই বন্ধ করার চেষ্টা করছে বলে। লড়াইবার শক্তি আর সামর্থ্য দুটোই তার অটুট আছে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সে দুবার লাফিয়ে উঠে সরে আসে পিছনে। পুলিশের ক্যাপ্টেন আর হস্তক্ষেপ না করে ফিরে যায়।

পিঠে ঠেস দিয়ে টুলে পরপর হতাশভাবে বসে আছে দমচ্ছট টম। লড়াইটা বন্ধ হয়ে গেলে রেক্সারি বাধ্য হই টমকে জমী ঘোষণা করত—কড়কড়ে ডলারগুলো চলে আসত পকেটে। টম তো আর স্যান্ডেলের মতো যশ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে লড়ছে না, ওর লড়াই শুধু তিরিশটা ডলারের জন্যে। আবার এক মিনিট অবসর পেয়ে গেল

স্যান্ডেল, এর মধ্যেই খানিকটা সামলে উঠবে নিশ্চয়।

তরুণের জয় সুনিশ্চিত—কে যেন টমের কবির কাছ থেকে গুণ গুণ করে উঠল। টমের মনে পড়ে গেল স্টাউশার বিলুকে হারাবার পর সে রাতে ও কার মুখে যেন এই একই কথা শুনেছিল। টমের এক অনুরাগী সমর্থক সেদিন এক ড্রিকের আশ্রয়ে জানিয়েছিল। সেই বলেছিল কথাগুলো। সে রাতে টমই ছিল তরুণ আর আজ তারুণ্যের প্রতিমূর্তি বাসে আছে তার বিপরীত দিকে। আধঘন্টা হয়ে গেল লড়ছে টম এবং টমের বয়সটা কম নয়। স্যান্ডেলের মতো লড়লে পনের মিনিটের বেশি সে টিকতে পারত না। আসল কথা দুই রাতভেঙে মধ্যবর্তী ওই সামান্য অবসরও পনের শব্দে শিরা আর আঁহত ক্রান্ত হৃৎপিণ্ড হাত কক্ষতা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হচ্ছে না। তাছাড়া দুর্বল শরীর নিয়েই সে শুরু করেছে। দুমাইল পথ হেঁটে আসা ঠিক হয় নি একেবারে। তাছাড়া সেই সকাল থেকে তার মাংস খাবার দুর্নিবার বাসনাটাও মেটে নি। কসাইরা গুকে ধার দিতে রাজি হয় নি মনে পড়তেই একরাশ ঘৃণা উঠলে ওঠে। একজন বয়স্ক মানুষের পক্ষে এমন আবেগটা খেয়ে লড়াইয়ে নামা সত্যিই অসুবিধাজনক। এক টুকরো মাংস আর এমন কী ব্যাপার—কয়েক পেনি তো দাম। কিন্তু সেটুকু ছুটলেও আজ হয়ত তিরিচাটা ডনার উপার্জন করতে পারবে টম।

একাদশ রাত্বেন্ডের ঘন্টা পড়তেই স্যান্ডেল তেড়ে এল। হাবডায়ে হাতই চাড়া দেখাতে চাক না কেন আসলে কিন্তু তা নয়। টম জানে পুরোটাই নয়। মুষ্টিযুদ্ধে মাকাতার আমল থেকেই এই ধাঙ্গা চাল। স্যান্ডেলের আক্রমণের প্রথম দমকটার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে টম গুকে প্রথমে আঁকড়ে ধরেছিল। তারপর রেফারি বাঁধন আলগা করে মুক্ত করে দিল স্যান্ডেলকে। টম যা চেয়েছিল তাই ঘটল। বা হাতের ঘূষি মারার ভঙ্গি করতেই স্যান্ডেল এক পাশে কাত হয়ে হাত কাঁকিয়ে ঘূষি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে অধোপা পেছনে সরে মোক্ষম একটা ডান হাতের আঘার—কাটে স্যান্ডেলকে ধরশায়ী করে ফেলল টম। তারপর এক মুহূর্তের অবসর নয়—মারের পর মার, হুক ও ড্রাইভ, হেরক রকমের মারে চরুচর করে দেয় স্যান্ডেলকে। নিজেও আঘাত পাচ্ছে কিন্তু তার বহুগুণ বেশি আঘাত দিচ্ছে। স্যান্ডেল জড়িয়ে ধরলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে, জড়িয়ে ধরার প্রয়াস পেলেই আঘাত হানছে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হলে নিজের একহাতের ডাকে টেনে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য হাতের ঘূষির আঘাতে দড়ি গায়ে ঠেলে দিচ্ছে। দড়ির উপর ফেলে দিতে পারলে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পারবে না—আরো আঘাত করার সুযোগ মিলবে।

ইতিমধ্যে শ্রেফাগুহ উদ্ভব। প্রতিটি দর্শক টমের হয়ে চোঁচাচ্ছে, 'শেষ করে দাও। শেষ করে দাও। গুকে শেষ করে ফালাও টম।' জর্ডাইয়ের অস্তিম পরিণতি আসবে ঘূষিঝড়ের দাপট নিয়ে, এই তো চায় বরিশের আসরের দর্শক। আধঘন্টা ধরে শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে টম এই মুহূর্তটির অপেক্ষায়। অকপণভাবেই সেই শক্তিকে এমন এক কাজে লাগাচ্ছে। এই তার একমাত্র সুযোগ—পারে তো এখনই পারবে। খুব দ্রুত ঘুরিয়ে আসছে টমের শক্তির সঞ্চয়। পুরোপুরি কক্ষতা হারাবার আগেই স্যান্ডেলকে একেবারে ধরশায়ী করতে পারবে বলে আশা রাখে টম। টম আঘাত হেনে চলে। প্রতিটি আঘাত ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করা। কতটা শক্তি ব্যয় হচ্ছে আর কতটা কতি করতে পারছে তারই চুলচেরা বিচার। স্যান্ডেলের মতো একজনকে নকআউট করা যে কী কঠিন তা সে উপলব্ধি করছে এখন। অসামান্য সহ্যশক্তি তার। এ হিংস্রত গুণ তাজা যৌবনেরই থাকে। স্যান্ডেল মুঠিযোদ্ধা হিসেবে নাম করবেই। এই রকম কঠিন পেশিতত্ত্ব দিয়ে তৈরি হয় সার্বক যোদ্ধাদের দেহ।

স্যান্ডেল টলমল করে কিন্তু টমের পায়ে খিচ ধরছে, হাতের গাঁটগুলো বিদ্রোহ করছে। তবু নিজেকে শক্ত করে টম। ভাঙবরতবে ঘূষি চালায়। প্রতিবার আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে তার জীর্ণ আহত হাতদুটো অশেষ যত্নসায় অস্থির হয়ে ওঠে। নিজে কোনো আঘাত পাচ্ছে না তবু স্যান্ডেলের মতোই প্রতি মুহূর্তে দুর্বল হতে পড়ছে সে। ঘূষিগুলো ঠিক জায়গাতেই পড়ছে কিন্তু ঘূষিতে আর সেই জোর নেই। একান্তিক ইচ্ছাক্রান্তির ফসলমাত্র। টম এখন পা ঘষড়ে ঘষড়ে নড়াচড়া করছে। দুর্বলতার লক্ষণটা চোখে পড়া মাত্র স্যান্ডেলের সমর্থকরা চিৎকার করে উৎসাহিত করতে চায় তাকে।

আবার প্রচণ্ড রূপ ধরে টম। পপরপর দুটা ঘূষি চালায়—বা হাতের মারটা লাগে একটু উচুতে, সোলার প্রেক্সাসে। ডান হাতেরটা এসে পড়ে চোয়ালের ওপর। মারে তেমন জোরে ছিল না। কিন্তু স্যান্ডেল এত দুর্বল, এতই বিহ্বল যে সঙ্গে সঙ্গে সে কাটা ছাগলের মতো লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে শুরু করে দিল। রেফারি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সময় গণনা শুরু করে দিল। দশ সেকেন্ড হাজার মধ্যে উঠে দাঁড়াতে না পারলেই ধরা। পুরো শ্রেফাগুহ জুড়ে উদ্গীরণ নীরবতা। কণ্ঠিত পায়ে দাঁড়িয়ে আছে টম। মৃত্যুকালীন আচ্ছন্নতা যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। সবচেয়ে দর্শকদের মুখগুলো সমুদ্রের মতো দোল খাচ্ছে, কাছে আসছে, দূরে সরে যাচ্ছে, আর বহুদূর থেকে যেন কানে ভেসে আসছে রেফারির সময় গণনা—এক—দু—

এরপরেও যৌবনই একমাত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। স্যান্ডেলও উঠে দাঁড়াল। চার গোনা হতেই সে গাড়িয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল। অন্ধের মতো দড়িটা ধরার জন্যে ছটফট করতে লাগল। সপ্তম সেকেন্ডে কোনোক্রমে ঘষড়ে ঘষড়ে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল। মাতালের মতো কী ধের ওপর মাথাটা এলোমেলো দুলছে। রেফারি 'নয়' হাঁকা মাত্র নিয়ে উঠে দাঁড়াল স্যান্ডেল। আত্মরক্ষার সঠিক ভঙ্গিতে বা হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে, ডান হাতে ঢেকেছে পেট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি সুরক্ষিত করে বেতালো পা ফেলে টমের দিকে এগিয়ে এল স্যান্ডেল। আশা করছে টমকে জাপটে ধরে আরো খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতে পারবে।

স্যান্ডেল উঠে দাঁড়ানো মাত্র দুবার ঘূষি চালায় টম। দুবারই কিন্তু তার আঘাত গিয়ে পড়ে স্যান্ডেলের ডাঁড় কাছ হাতের বর্মের ওপর। পর মুহূর্তেই স্যান্ডেল মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে টমকে। দুজনকে ছাড়িয়ে দেবার চেঁচায় হাত লাগায় রেফারি। টমও চেষ্টা করে মুক্তি পাবার। টম জানে যুবকরা কত ভাতাতাড়ি সামলে ওঠে। স্যান্ডেল যদি সামলে ওঠার সময় না পায় টমের জয় সুনিশ্চিত। একটা সোজা আঘাতই যথেষ্ট। স্যান্ডেলকে সে যে—প্যাঁচে ফেলেছে জয় তার অবধারিত। মুষ্টিযুদ্ধের রীতিনীতি ও কোর্সাল—সব দিক দিয়েই সে পরাজিত করেছে স্যান্ডেলকে। জট খুঁজে যাওয়ায় স্যান্ডেল এখন দুর্বল পড়ে গেছে। টিকে থাকা না থাকার এক স্বল্পটময় সন্ধিক্ষণে দৌদ্রাম্যান স্যান্ডেল। একটি উত্তম মার এখন ঘূষি দিয়েই তিক্ততায় ভরে ওঠে সমস্ত মনটা। মাংসটুকু পেলে হয়তো এই মুহূর্তে তার খোঁটা ঠিক প্রয়োজনমতো জোরালো হতে পারত। সমস্ত সাধারণ শক্তি একত্রিত করে টম ঘূষি মারল কিন্তু তাতে না আছে জোর, না আছে গতি। স্যান্ডেল টলে গেল কিন্তু পড়ল না। কোনারদের মারে এসে দড়ি ধরে দাঁড়াল। টমও বেসামাল পালয়ে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে হত্যাগ্রস্ত মানুষের শেষ চেষ্টা হিসেবে আবার ঘূষি চালাল। কিন্তু ওর দেহের ওপর কোনো নিশিত্রণ নেই। আছে শুধু লড়াইকু মনোভাব ও তা স্ত্রান খাপসা হয়ে এসেছে

ক্লান্তিতে। যে আঘাতটা চোয়ালের ওপর পড়ার কথা সেটা কাঁধের ওপর এল। আরো উচতে ঘুমিটা চালাতে চেয়েছিল টম কিন্তু ক্লান্ত মাসপেশি তার সেই আদেশ পালন করতে পারে নি। উদ্বেগে আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেই টমল করে ওঠে, আরেকটু হলেই পড়ে যেত। আবার চেষ্টা করে টম। এবার পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট। অপরিণীম ক্লান্তিতে স্যান্ডেলের গায়ের ওপর আছড়ে পড়ে। স্যান্ডেলকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে নিজের পতন রোধ করে।

টম নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না। আর তার করার কিছু নেই। টম ফুরিয়ে গেছে। জয়লাভ করেছে যৌবন। আলিসনে আবদ্ধ থাকার সময়েই টম অনুভব করে স্যান্ডেল শক্তি ফিরে পাচ্ছে। রেফারি গুনের ছাড়িয়ে নেবার পর টম দেখে সাক্ষ্য যৌবন কেমন বলীয়ান হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। প্রথম দিকে স্যান্ডেলের ঘূষিতে কোনো জোর ছিল না, আদৌ কার্যকর হয় নি। কিন্তু ক্রমেই জোরালো আর নির্ভুল হয়ে উঠছে তার মারগুণ্ডো। ঝাপসা চোখে টম দেখে গ্রাভস্ পুরা একটা হাত তার চোয়াল লক্ষ্য করে ছুঁতে আসছে। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে হাত তুলে আঘাত বাঁচাতে চায় টম। কিন্তু মনে চাইলেও দেখে পারে না। হাত তো নয় বেন কার্যকর মল সিসে। এমনিতে উঠতে চায় না হাতটা, তাই ইচ্ছাপ্রকৃতি দিয়ে তাকে ঠেলে তুলতে চায় টম। গ্রাভস্ পুরা হাতটা এসে পড়ল টমের চোয়ালে। বিদ্যুৎস্পর্শ হবার মতো একটা শুষ্ক ঝলক—সঙ্গে সঙ্গে আঁধারের গুড়না এসে ঢেকে দিল টমকে।

টম চোখ খুলে দেখল সে রিঙের ধারে নিজের জায়গায় বসে আছে। বস্তির সমুদ্র উপকূল ডেউয়ের গর্জনের মতো ভেসে আসছে দর্শকদের চিৎকার। স্পঞ্জ করে তার ঘাড় জল দেওয়া হচ্ছে। মুখ আর বুকের ওপর ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে সিড সুলিভান তাকে চাসা করতে চাইছে। হাতের গ্রাভস্ দুটো আগেই খুলে নেওয়া হয়েছে। স্যান্ডেল ওর ওপর বৃক্কে পড়ে করমর্দন করছে। টমকে আজ হারিয়ে দিয়েছে স্যান্ডেল কিন্তু তার জন্যে ওর প্রতি একটুও বিরূপ বোধ করে না টম। উৎফুল্লভাবেই করমর্দন করে। আঙুলের চাপে ভাঙা গাঁটগুলো অত্যন্ত পীড়া দেয়। স্যান্ডেল এবার মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তরঙ্গ যোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে আর বাজির পরিসর বাড়িয়ে একশো ডলার করে দেয়। দ্বিবিমানভাবে তাকিয়ে থাকে টম। সহকারীরা ওর মুখ থেকে জল মুছে মঞ্চ পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। হঠাৎ ক্ষুধার্ত বোধ করে টম। বিদের জ্বালা নয়—একটা অবশ ভাব, জঠরের অভ্যন্তরে একটা দপদপানি যেটা সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। টমের মনে পড়ে যায় লড়াইয়ের সেই বিশেষ মুহূর্তটার কথা। স্যান্ডেলের তখন পুরোপুরি বিপর্যস্ত বেসামাল অবস্থা। পরাজয়ের গম্বীর তাকে তুলিয়ে দিতে পারত টম অতি সহজেই। মাংসটুকু যদি খেতে পেত—ওই বাড়তি ক্ষমতটুকু নিশ্চয় থাকত তার। শেষ আঘাতের পেছনে সামান্য একটু ক্ষমতার অভাবই টমের পরাজয় ডেকে এনেছে। শুধু মোকদ্দমকে খেতে না পাবার জন্যেই হেরে গেল টম।

দড়ির ফাঁক গলে বেরোবার সময় টমকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল সহকারীরা। তাদের সরিয়ে দিয়ে টম নিজেই মাথা নিচু করে দড়ি পেরিয়ে ভারী পায়ে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নামল। সহকারীরা ভিড় সরাতে লাগল আর টম তাদের পিছু পিছু চলল। ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে হলঘরটা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতে যাবে, পেছন থেকে কয়েক জন ছোকরা বলে উঠল, ‘অমন সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলে কেন?’

‘বেশ করেছি!’ এক কথায় উত্তর সেরে সিঁড়ি কটা টপকে রাস্তায় এসে নামল টম।

মোড়ের মাথায় পাবলিক হাউসের সুইট—ডোরটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। টম দেখল

ভিতরে ঝলমল করছে আলো, হাসিমুখে মহিলারা ড্রিংক পরিবেশনে ব্যস্ত, আজকের লড়াই নিয়ে আলোচনা চলছে, বারের ওপর প্রচুর মদ্যার স্বনামনি। কে যেন টেটিয়ে ড্রিংকের আমন্ত্রণ জানাল। একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল টম তারপর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে এগিয়ে চলল।

পকেটে একটা আধলা নেই। দুমাইল হেটে ফেরা সোজা কথা নয়। সতিহি বয়স হয়ে যাচ্ছে টমের। ডোমেন পেরিয়ে হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা বেশির ওপর বসে পড়ল টম। ভাবতেই মনটা দমে যাচ্ছে যে লড়াইয়ের ফলাফল জানবার জন্যে ওরই পথ চেয়ে ওর বী হা করে বসে আছে বাড়িতে। লড়াইয়ের নকআউট হওয়ার চেয়েও ঢের ভয়াবহ এখন ওর সন্মুখীন হওয়া। কী করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে পায় না টম।

অত্যন্ত দুর্বল লাগে। সারা শরীর যেন জ্বলছে। হাতের ভাঙা গাঁটগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় মাটি কাটার কাজ পেলেও এক সপ্তাহের আগে কোস্টাল বা বেলচা চালাতে পারবে না। বিদেটা যেন আগুন হয়ে জ্বলছে পেটের মধ্যে। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছে। নিজের অসহায় অবসন্ন অবস্থা দেখে ভেঙে পড়ে টম। অবাকভাবে ভিক্ষে ওঠে দুচোখ। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় বহুদিন আগে স্টাউশার বিলকে হারাবার রাতটার কথা। বেচারি স্টাউশার। এতদিনে টম বুঝতে পারে স্টাউশার কেন সেদিন ড্রেসিংরুমে বসে কামায় ভেঙে পড়েছিল।